উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০১

রবীন্দ্রনাথের কাব্য

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ বলাকা কাব্য

একক ২ কাব্য

একক ৩ বলাকা

একক ৪ কবিতাপাঠ

একক ৫ কবিতাপাঠ

একক ৬ পত্রপুট

একক ৭ কবিতা

পর্যায় – খ

একক ৮ চিত্রা- আলোচনা

একক ৯ চিত্রা

একক ১০ চিত্রার কাব্যসৌন্দর্য

একক ১১ পূরবী – সাধারন আলোচনা

একক ১২ কবিতা বিশ্লেষণ

একক ১৩ কবিতা বিশ্লেষণ

একক ১৪ নির্বাচিত কবিতা

কোরপত্র – ৪০১ রবীন্দ্রনাথের কাব্য

পর্যায় – খ

একক ৮ চিত্রা- আলোচনা - আলোচনার ভূমিকা, রচনার উদ্দেশ্য, গ্রন্থপরিচয়, পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর, সমালোচনা ও কবিকৃত ব্যাখ্যা।

একক ৯ চিত্রা - চিত্রা গ্রন্থের বিষয়বৈচিত্র্য, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্র মানসিকতা, জীবনদেবতার ভাবনা, রূপকথার জগত থেকে অন্তর্জগতের বাস্তবতা, মর্ত্যপ্রীতিমূলক কবিতা ও এবার ফিরাও মোরে, সৌন্দর্যবোধের কবিতা ও উর্বশী, কাহিনীপ্রধান কবিতা।

একক ১০ চিত্রার কাব্যসৌন্দর্য - আঙ্গিক ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ, পাঠান্তরে প্রেমের অভিষেক ও মৃত্যুর পরে, চিত্রার আঙ্গিক বিশ্লেষণ, ছন্দ বৈচিত্র, অলংকার ও চিত্রকল্প, রবীন্দ্র কাব্যে চিত্রার স্থান।

একক ১১ পূরবী – সাধারন আলোচনা - পূরবী রচনার পটভূমি।

একক ১২ কবিতা বিশ্লেষণ – পূরবী, মাটির ডাক, পঁচিশে বৈশাখ, তপভঙ্গ, আগমনী।

একক ১৩ কবিতা বিশ্লেষণ – লীলাসঙ্গিনী, বকুল বনের পাখি, সাবিত্রী, লিপি, শেষ বসন্ত।

একক ১৪ নির্বাচিত কবিতা - পূরবী, মাটির ডাক, পঁচিশে বৈশাখ, তপভঙ্গ, আগমনী, লীলাসঙ্গিনী, বকুল বনের পাখি, সাবিত্রী, লিপি, শেষ বসন্ত।

একক ৮ চিত্রা - আলোচনা

বিন্যাসক্রম

৮.১ আলোচনার ভূমিকা

৮.২ রচনার উদ্দেশ্য

৮.৩ গ্রন্থপরিচয়

৮.৪ পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর

৮.৫ সমালোচনা ও কবিকৃত ব্যাখ্যা

৮.৬ অনুশীলনী

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ আলোচনার ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব গত শতাব্দীর শুধু নয়, বিগত সহস্রাব্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কালজয়ী এই প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানা রবীন্দ্রনাথের মালা গাঁথা হয়ে থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের ‘কবি’ পরিচয়টিই সবার প্রধান হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই মনে করতেন, তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে তিনি কবি। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লেখা ‘আত্মপরিচয়’-এর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন – “জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি

মাত্র। ... আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই....”। স্বাভাবিকভাবেই, কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝে নেওয়া আমাদের আলোচনার প্রধানতম দিক।

আবার কবি রবীন্দ্রনাথ বলতেই বা আমরা ঠিক কী বুঝি? তাঁর লেখা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা সংকলনের মধ্যে ফুটে ওঠা কবি-মানসিকতাটিকে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতায় ধরাও অসম্ভব। এই কবি-মানসের গড়ে ওঠারও একটা ইতিহাস আছে। উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র। কিন্তু উনিশ শতকীয় ভাবসংঘাতের দোদুল্যমানতায় এঁদের কবিতা পুরোপুরি আত্মগত ভাবোচ্ছাসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। এই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই আমরা দেখেছি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘সারদামঙ্গল’-এ। আর প্রথম জীবনের রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু ছিলেন এই বিহারীলালই। অন্তত ‘কড়ি ও কোমল’-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করেছিলেন পূর্বসূরিরা। কড়ি ও কোমল থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার যাত্রা শুরু।

বস্তুত, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনার প্রকৃতিকে একটি মাত্র সত্যের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ করতে গেলে মানসী থেকে ‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালী’র ভাববস্তুকে মনে রাখতেই হবে। বলা বাহুল্য, সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের সম্পর্কের একটি নিবিড় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার প্রধানতম দিক। আর এই অনুভূতির সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার ভাবনা ও রহস্য।

জীবনদেবতার স্বরূপ নিয়ে আবার সমালোচকদের মধ্যে নানান তাত্ত্বিক বিতর্ক ও মতভেদ আছে। কখনও একে দেখা হয়েছে সৌন্দর্য-চেতনার দিক থেকে, কখনও নিসর্গ-অনুভূতির বিচারে। আবার কখনও একে দেখা *হয়েছে* কবির গভীরতম অন্তরসত্তা রূপে বা কখনও মহাচৈতন্য রূপে। এর মধ্যে কোনটি সঠিক, তা তুলে ধরা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। সমালোচকদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার নিরিখে একটি মাত্র মতবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে তুলে ধরা চলে কিনা সেটাও বিতর্কের বিষয়। তবে এই সব বিতর্ককে সরিয়ে রেখে আমরা শরণাপন্ন হতে পারি রোলাঁ বার্থ- (Roland

Barthes)-এর। এই ফরাসি চিন্তাবিদ তার একটি প্রবন্ধে (The Death of the Author-1968) দেখিয়েছেন কীভাবে একটি Text ক্রমশ রচয়িতার কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথকে জানা, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে জানা, তাঁর সামগ্রিক রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বোধকরি একজন বাঙালির কাছে আজও অত্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যাপার। মৃত্যুর বহু বছর পরেও মানুষটি দারুণভাবে জীবিত। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চারখণ্ডের বৃহৎ রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। তার সাম্প্রতিকতম সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন প্রশান্তকুমার পালের এযাবৎ প্রকাশিত দশ খণ্ডের 'রবিজীবনী'। বহু ঢাকা পড়ে থাকা নথি-পত্র ও তথ্যাবলি ঘেঁটে প্রশান্তকুমার এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়েছেন। এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় আগামী প্রজন্মের কাছেও রবীন্দ্রনাথ গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হবেন। নতুন রূপে তিনি আবিষ্কৃত হবেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর সীমায় চিনে নেওয়ার কৌতুহলকে জাগিয়ে তোলার রসদ থাকবে। আমাদের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য এটাই।

বাংলা গীতিকবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথের যুগ এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরাও আমাদের আলোচনার এটি লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গেই পাঠক জানতে পারবেন রবীন্দ্রপর্বের অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের কথা।

রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল রচনা কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া এই আলোচনায় সম্ভব নয়। তাই তাঁর রচনাকর্মের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা একটির আর এক উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কবিতা-রচনার সঙ্গে পরিচয় করানো এবং সেই সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পর্বে সেই কবিতার পালাবদলের কথা, তার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা এককটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

‘চিত্রা’ রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্যতম একটি বিশিষ্ট কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের এমন একটি সময় এই কবিতাগ্রন্থটি লেখা হয়, যখন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মানসী থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার স্বকীয়তার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছিল। ‘চিত্রা’য় পৌঁছে সব দিক থেকেই সেই স্বকীয়তার বৃত্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ফলে রবীন্দ্র-কবিতায় ‘চিত্রা’র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অলোচনা, সমালোচনার কেন্দ্রে থেকেছে। ‘চিত্রা’ প্রকাশিত হবার পর থেকেই এর কবিতাগুলি নিয়ে অলোচনার বা সমালোচনার তুফান ওঠে। এই কবিতাগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা বিশেষ করে জীবনদেবতা সম্পর্কে পাঠকমহলে ও সমালোচক মহলে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থের ভাবলোক বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে একাধিকবার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর একশো বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবু ‘চিত্রা’ সম্পর্কে পাঠকমহলে আগ্রহ খুব একটা কমেনি। সুতরাং এমন একটি জীবন্ত, এমন একটি চিরন্তন কবিতাগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করা আমাদের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের এই এককটি পাঠ করলে — ‘চিত্রা’ কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ ও তৎসংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

‘চিত্রা’-র কতগুলি সংস্করণ এ যাবৎ হয়েছে, সেই সমস্ত সংস্করণে কী কী পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যাবে।

চিত্রা’র কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি এবং পাঠান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও তার বিশ্লেষণ সম্পর্কে সাধাবণ ধারণা লাভ করা যাবে। ‘চিত্রা’সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সমালোচকদের সমালোচনা কী ছিল এবং বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা কী ছিল, তার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। চিত্রা’ কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কত রকম বিষয়-বৈচিত্র্য আছে, সেই সময় বিষয় ও তার বৈশিষ্ট্যগুণ সম্পর্কে পাঠক সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৮.২ রচনার উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ আলোচনার পূর্ব প্রেক্ষাপট রূপে উনিশ শতকের বাংলা কবিতা তথা রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা কবিতার ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করা আমাদের আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য। এই এককটি পাঠ করলে -

ক) মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার অবসানে, আধুনিক যুগে বাংলা কবিতার যে সূত্রপাত হয়েছিল তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

খ) রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা কবিতায় আখ্যায়িকা কাব্যের ধারাটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যাবে। বিশেষ করে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের আখ্যায়িকাকাব্য সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা এককটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

গ) রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতিকবিতার প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাসে আখ্যায়িকা কাব্যধারার পাশাপাশি খন্ডকবিতার ধারাটি সমান্তরালভাবে থাকায়, কীভাবে গীতিকবিতার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছিল তার ইতিহাস সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা রচনাটির আর একটি উদ্দেশ্য।

ঘ) রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতিকবিতায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর অবদান এবং বিহারীলাল পর্বে বাংলা গীতিকবিতার অন্যান্য কবি ও তাঁদের কাব্যধারার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত করে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটিকে পরিষ্কার করে দেওয়া এককটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮.৩ গ্রন্থ-পরিচয়

প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রা’ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৯ ফাল্গুন, ১৩০২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৬-এর ১১ মার্চ তারিখে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে?

চিত্রা। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১ || ০ টাকা।

মন্তব্য

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় আছে

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩০২।

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এই গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ: ১১ মার্চ ১৮৯৬, মুদ্রণ-সংখ্যা: ১০৫০, মূল্য : দেড় টাকা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল : ১৫১।

'চিত্রা' গ্রন্থের এই প্রকাশ সংক্রান্ত তালিকায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও সব থেকে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই গ্রন্থ কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। সে দিক থেকে এযাবৎ প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থের মধ্যে চিত্রা' একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা চলে।

'চিত্রা'-র বর্তমান সংস্করণের অন্তর্গত মোট উনচল্লিশটি কবিতার মধ্যে পনেরটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রম-অনুসারে কবিতাগুলির প্রকাশকাল ছিল এরকম –

কবিতা	পত্রিকা	প্রকাশকাল - বঙ্গাব্দ
সুখ	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
জ্যোৎস্নারাতে	ওই	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
প্রেমের অভিষেক	ওই	ফাল্গুন ১৩০০
সন্ধ্যা	ওই	মাঘ ১৩০১
এবার ফিরাও মোরে	ওই	চৈত্র ১৩০০
স্নেহস্মৃতি	ভারতী	কার্তিক ১৩০২

কবিতা	পত্রিকা	প্রকাশকাল - বঙ্গাব্দ
নববর্ষে	সাধনা	বৈশাখ ১৩০১
মৃত্যুর পরে	ওই	জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
অন্তর্যামী (প্রথম তিনটি স্তবক)	ওই	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
সাধনা	ওই	অগ্রহায়ণ ১৩০১
ব্রাহ্মণ	ওই	ফাল্গুন ১৩০১
পুরাতন ভৃত্য	ওই	চৈত্র ১৩০১
দুই বিঘা জমি	ওই	আষাঢ় ১৩০২
শীতে ও বসন্তে	ওই	শ্রাবণ ১৩০২
নগর সংগীত	ওই	ভাদ্র কার্তিক ১৩০২

কবিতাগুলি রচনার স্থান ও সময়কাল

চিত্রা'র অন্তর্গত কবিতাগুলি'রবীন্দ্রনাথ চৈত্র, ১২৯৯ থেকে শুরু করে ফাল্গুন – ১৩০২-দু বছরের কিছু বেশি সময় ধরে লিখেছিলেন। বহু কবিতার পাণ্ডুলিপি না পাওয়া যাওয়ায় রচনা স্থান সম্পকে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পালের দেওয়া তথ্য অনুসারে কবিতাগুলির (যেগুলি সম্পর্কে জানা গেছে) রচনা স্থান ও সময়কাল নিম্নরূপ :

কবিতা	রচনাস্থান	সময়কাল বঙ্গাব্দ
সুখ	রামপুর-বোয়ালিয়া	১৩ চৈত্র, ১২৯৯
জ্যোৎস্নারাত্রে	কলকাতা	৫ মাঘ, ১৩০০
রাত্রি প্রেমের অভিষেক	ওই	১৪ মাঘ, ১৩০০

মন্তব্য

কবিতা	রচনাস্থান	সময়কাল বঙ্গাব্দ
সন্ধ্যা	পতিসর	৯ ফাল্গুন, ১৩০০
এবার ফিরাও মোরে	রামপুর-বোয়ালিয়া	২৩ ফাল্গুন, ১৩০০
স্নেহস্মৃতি	কলকাতা	৩১ চৈত্র, ১৩০০
নববর্ষে	ওই	১ বৈশাখ, ১৩০১
দুঃসময়	ওই	৫ বৈশাখ, ১৩০২
মৃত্যুর পরে	ওই	৫ বৈশাখ, ১৩০২
ব্যাঘাত	কলকাতা	৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১
অন্তর্যামী (প্রথম তিন স্তবক)	শিলাইদহ	২৫-২৬ শ্রাবণ, ১৩০১
অন্তর্যামী (বাকি স্তবক)	ওই	ভাদ্র, ১৩০১
সাধনা	শান্তিনিকেতন	৪-৬ কার্তিক, ১৩০১
ব্রাহ্মণ	শিলাইদহ	৭ ফাল্গন, ১৩০১
পুরাতন ভৃত্য	ওই	১২ ফাল্গুন, ১৩০১
দুই বিঘা জমি	পতিসর-যাত্রাপথে বোটে	৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
শীতে ও বসন্তে	সাজাদপুর	১৮ আষাঢ়, ১৩০২
নগর-সংগীত	জানা যায়নি	জানা যায়নি তবে

সাধনা'য় ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যার প্রকাশ ছিল ১৫ ভাদ্র ১৩০২। তাই কবিতাটি আষাঢ় থেকে ভাদ্রের শুরুর মধ্যেই রচিত হওয়া সম্ভব।

পূর্ণিমার	পতিসর থেকে সাজাদপুরের পথে	১৬/১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০২
চিত্রা	সাজাদপুরের পথে	১৮ অগ্রহায়ন, ১৩০২
আবেদন	সাজাদপুর থেকে শিলাইদহে যাত্রাপথে	২২ অগ্রহায়ন, ১৩০২

কবিতা	রচনাস্থান	সময়কাল বঙ্গাব্দ
উর্বশী	ওই	২৩ অগ্রহায়ন, ১৩০২
স্বর্গ হইতে বিদায়	শিলাইদহ	২৪ অগ্রহায়ন, ১৩০২
দিন শেষে	ওই	২৮ অগ্রহায়ন, ১৩০২
সান্ত্বনা	ওই	২৮ অগ্রহায়ন, ১৩০২
শেষ উপহার	ওই	১ পৌষ, ১৩০২
বিজয়িনী	জানা যায়নি	১ মাঘ, ১৩০২
গৃহশত্রু	কলকাতা	১৫ মাঘ, ১৩০২
মরীচিকা	কলকাতা	১৬ মাঘ, ১৩০২
উৎসব	ওই	২২ মাঘ, ১৩০২
প্রস্তর মূর্তি	ওই	২৪ মাঘ, ১৩০২
নারীর দান	ওই	২৫ মাঘ, ১৩০২
জীবন দেবতা	শিলাইদহ (প্র, মুখোপাধ্যায়)	২৯ মাঘ, ১৩০২
রাতে ও প্রভাতে	সঠিক জানা যায়নি	১ ফাল্গুন, ১৩০২
১৪০০ সাল	জানা যায়নি	২ ফাল্গুন, ১৩০২
নীরব তন্ত্রী	জানা যায়নি	৪ ফাল্গুন, ১৩০২
দুরাকাঙ্ক্ষা	ওই	৪ ফাল্গুন, ১৩০২
প্রৌঢ়	কলকাতা	৭ ফাল্গুন, ১৩০২
ধূলি	কলকাতা	১৫ ফাল্গুন, ১৩০২
সিন্ধুপারে	কলকাতা	২০ ফাল্গুন, ১৩০২

সংস্করণ পরিচিতি

'চিত্রা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ (২৯ ফাখুন, ১৩০২ব.)-এ। প্রকাশক ছিলেন শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী। এই প্রথম সংস্করণে সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলির মধ্যে পনেরোটি কবিতা (আমরা আগেই উদ্ধার করেছি) আগেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'সুখ' রচিত হয়েছিল 'সোনার তরী' রচনা পর্বে 'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' রচিত হয়েছিল ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দে। আর সুখ' রচিত হয় ১৩ চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে। কিন্তু 'সুখ' কবিতাটি 'সোনর তরী' কবিতাগ্রন্থে স্থান পায়নি। স্থান পেয়েছে 'চিত্রা'-য়, যার প্রথম কবিতা রচিত হয়েছে মাঘ, ১৩০১ বঙ্গাব্দে।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার ছমাস পরে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয় (আশ্বিন, ১৩০৩ব.)। প্রকাশক ছিলেন সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে চিত্রা সহ মোট কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চিত্রার পুনঃপ্রকাশকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ধরা যেতে পারে। কেননা 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে 'চিত্রা'য় মোট সাতচল্লিশটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি কবিতা ও নটি গান নতুন সংযোজিত হয়েছে। তেমনই পূর্বতন সংস্করণ থেকে একটি কবিতা বর্জিতও হয়েছে। বর্জিত কবিতাটি 'নীরব-তন্ত্রী'। আর সংযোজিত চারটি কবিতা হল – 'স্নেহস্মতি', 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' এবং 'ব্যাঘাত' ।'চিত্রা' রচনা-পর্বের বিভিন্ন সময়ে রচিত যে নটি গান এখানে সংযোজিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল --

প্রথম ছত্রের সূচি	'চিত্রা'য় শিরোনাম	রচনাকাল
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে	বিকাশ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ব
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে	বিস্ময়	১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ব.
সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি	বন্দনা	১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ব.

প্রথম ছত্রের সূচি	'চিত্রা'য় শিরোনাম	রচনাকাল
(কত) কথা তারে ছিল বলিতে	মনের কথা	১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ব,
আমারে করো তোমার বীণা	আত্মোৎসর্গ	১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১,
কে দিল আবার আঘাত	অতিথি	১২ আশ্বিন, ১৩০২ব,
এসো গো নূতন জীবন	নবজীবন	১৩ আশ্বিন, ১৩০২ব,
পুষ্প বনে পুষ্প নাহি	মানববসন্ত	১৪ আশ্বিন, ১৩০২ব.

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল 'চিত্রা'র 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতা তিনটি কথা ও কাহিনী'-তেও সংকলিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে এই কবিতা তিনটি 'চিত্রা'য় থাকলেও রচনাবলী সংস্করণ থেকে তা বর্জন করা হয়েছে।

এই দুটি সংস্করণ ছাড়া এযাবৎ 'চিত্রা'-র আরও চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫-১৯১৬ তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ইন্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক দশ খন্ডে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ সংস্করণটিতে 'চিত্রা'-র পূর্ববর্তী সংস্করণের নতুন সংযোজিত গান ও কবিতাগুলি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায় শেষ চিত্রা'র সংস্করণ হয় ১৯৪০ (শ্রাবণ ১৩৪৭ব.)-এর রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে। এবং এই রচনাবলী সংস্করণে কবির ইচ্ছানুসারে পুনরায় কবিতাগুলি মাত্র গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে 'চিত্রা'-র আরও দুটি সংস্করণ হয়। একটি অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে এবং শেষটি পৌষ ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। শেষ সংস্করণ দুটিতে রচনাবলী সংস্করণের কবিতাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে 'চিত্রা' সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনা বা মতকে গ্রন্থের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। এই পরিচিতি সংস্করণই এখন প্রচলিত।

৮.৪ পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর

'চিত্রা'-য় সংকলিত, বেশিরভাগ কবিতারই কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। আর যে সমস্ত পাওয়া গেছে সেগুলি মূলত দুটি পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল। এই দুটি পান্ডুলিপির বিবরণ যথাক্রমে –

কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে সেগুলি মূলত দুটি পাণ্ডুলিপি

১। 'M.S. 129' — এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উপযোগী করে বাঁধানো। রুলটানা কাগজের এই খাতাটিতে ১৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৯৪ পৃষ্ঠা লেখা আছে। এখানে চিত্রা'-র প্রথম ১৯৪ পষ্ঠা লেখা আছে। এখানে চিত্রা'-র প্রথম দিকের রচিত কতকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে। চিত্রা ছাড়াও ওই পাণ্ডুলিপিতে 'সোনার তরী', 'গীতবিতান', 'কথা ও কাহিনী' এবং 'ছিন্ন পত্র'-এর কিছু কিছু লেখা স্থান পেয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু লেখা স্থান পেয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির রচনাকাল ১৮৯২ থেকে ১৯০০-র মধ্যে।

২। 'মজুমদার পুঁথি' – শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের একটি পাণ্ডুলিপি আছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে এই পাণ্ডুলিপির মাইক্রো-ফিলম ও ফটোকপি দুটি খণ্ডে সংগহীত আছে। এই খণ্ড দুটির নির্দেশক সংখ্যা যথাক্রমে - 426(1), ")! খাতার উপরে লেখা ছিল R.N. TAGORE/POCKET BOOK/1849. কানাই সামন্ত এই পাণ্ডুলিপির নাম করেছেন মজুমদার পুঁথি। এই 'পকেট বুক'-টিতে 'চিত্রা', 'সোনারতরী', 'স্মরণ', 'উৎসর্গ প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা ছাড়াও অনেক ব্রহ্মসংগীত, হিসাব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্যের হস্তলিপি এখানে আছে।

মজুমদার পুথি'তে 'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত শেষ তিনটি কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত গানগুলিও এই পুথিতে পাওয়া যায়। | উপযুক্ত দুটি পুথি ছাড়াও 'চিত্রা'-র আর একটি পুথির সন্ধানও পাওয়া যায়। সেটি 'M.S. 274.' অবশ্য এই শেষ পাণ্ডুলিপিটিতে 'চিত্রা'র একটি মাত্র কবিতারই পাণ্ডুলিপি আছে। কবিতাটি -

‘স্নেহস্মৃতি। উল্লেখ করার বিষয়, এই কবিতাটির কোনো রচনা তারিখ দেওয়া নেই। কিন্তু এই কবিতাটিরই অনুলিপি পাওয়া যায় 'M.S. 129'-এ। সেখানে কবিতাটির রচনা-তারিখ দেওয়া আছে বৃহস্পতিবার ১২ এপ্রিল ১৮৯৪। অবশ্য মুদ্রিত ‘চিত্রা’ গ্রন্থে কবিতাটির শেষে রচনার স্থান কাল দেওয়া আছে। ‘জোড়াসাঁকো/বর্ষশেষ ১৩০০'।

‘চিত্রা’র কবিতাগুলির প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে পাঠান্তর খুব কমই আছে। বেশিরভাগ কবিতারই শব্দগত পাঠান্তর কম বেশি ঘটেছে। কিন্তু তারই মধ্যে তিন-চারটি কবিতায় বেশ কিছু পাঠ বর্জিত হয়েছে, অথবা পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা এই কবিতাগুলির পাঠান্তর নিয়ে আলোচনা করব।

চিত্রা’-র যে কবিতাটির পাঠ বর্জন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র বিনিময় ঘটেছিল, সেই কবিতাটি হল প্রেমের অভিষেক। ‘সাধনা’-র ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতাটির অনেকটা অংশ কবি গ্রন্থ প্রকাশের সময় বর্জন করেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র-রচনাবলী’র ‘চিত্রা’-র সূচনায় কবি বলেছেন - “তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকণ্ঠিত কলমে তুলে দিয়েছিলুম।” এই পাঠ বর্জন করাতেই প্রভাতকুমার প্রচলিত পাঠের শুরুতেই ছিল সেই বর্জিত পাঠ।

সেখানে ক্ষুদ্র এক বাঙালি কেরানির কথা বলা হয়েছে। যার প্রভু বিদেশি ইংরেজ যে “কঠোর কতাক্ষপ উচ্চে বসি হানে / সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে, / মাের দুঃখ নাহি মানে; কর্মশেষে কেরানিটি যখন ঘরে ফিরে আসে।

“.. এত বলি হাস্যমুখে

ফিরে আমি আপনার সন্ধ্যাদীপ জ্বালা

আনন্দমন্দির মাঝে, নিভৃত নিরালা

শান্তিময়। - প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি

আমি যেথা রাজা! আমার নন্দনভূমি।

একান্ত আমার। ...

ধন্য আমি, আপনাতে রেখেছি ভরিয়ে

তব প্রেম; ... ”

কেরানিটির অতি তুচ্ছ জীবন এভাবেই তব প্রেমমন্ত্রবলে’ - আনন্দময় হয়ে ওঠে। স্থানাভাবে দীর্ঘ কবিতাটির উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক রবীন্দ্র-রচনাবলী’তে ‘চিত্রা’-র গ্রন্থ পরিচয় দেখে নিতে পারেন। তবে উল্লেখ করার বিষয় এটিই যে, ‘সাধনা’র মুদ্রিত পাঠকে কবি কবিতাটির আদি রূপ বলছেন না, বলছেন পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে ‘চিত্রা’-য় মুদ্রিত বর্তমান পাঠটিকেই – “প্রেমের অভিষেক কবিতার্টি চিত্রা কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা যায় না - কারণ, ইহাই উহার আদিম রূপ। ... এই সমস্ত আলাোচনাদি শুনিয়া আমি গাোড়ায় যেভাবে লিখিয়াছিলাম, সেইভাবে প্রকাশ করিয়াছি।” (দেশ’, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ব, পৃ. ১৭৫) চিত্রা'-র প্রকাশিত পাঠটিই যদি আদিমরূপ হয় তবে সেই আদিম রূপের পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়নি।

পাঠান্তরের আলোচনায় দ্বিতীয়, কবিতাটি হল ‘মৃত্যুর পরে’। এই কবিতাটি সাধনায় যেরকম মুদ্রিত হয়েছিল, বা গ্রন্থাকারে যে রূপটি আমরা দেখি তার সঙ্গে পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির কিছুটা পার্থক্য আছে। পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতাটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘শান্তি’। আর সেখানে কবিতাটিও ছিল আকারে সংক্ষিপ্ত। বর্তমান মুদ্রিত কবিতাটির ১, ২, ৪, ৬, ৭, ২০ ও ২১ এই সাতটি স্তবকে পাণ্ডুলিপির কবিতাটি সাজানো ছিল। যেখানে বর্তমান কবিতাটি মোট একুশটি স্তবকে লেখা। অনুমান করা সহজ যে কবিতাটি মুদ্রিত করার আগে কতটা পরিবর্তন করা হয়েছিল।

‘চিত্রা’র পাণ্ডুলিপি এবং পাঠান্তর নিয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা হল ‘অন্তর্যামী’। এই কবিতাটি প্রচলিত সংস্করণে পাঁচটি স্তবকে রচিত। কিন্তু প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবকই মাত্র দেখা যায়। অর্থাৎ বাকি স্তবকগুলি পরবর্তী সময়ে রচিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু উল্লেখ করার বিষয়টি হল, কবিতাটি ‘সাধনা’

পত্রিকায় যখন মুদ্রিত হয়েছিল, তখন এতে আর তিনটি স্তবক ছিল, যে স্তবক তিনটি মুদ্রিত গ্রন্থে বর্জিত হয়।

৮.৫ চিত্রা'র সমালোচনা; কবিকৃত ব্যাখ্যা

চিত্রা'-র বেশ কিছু কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক মহলে পতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যেমন 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি 'সাধনা'য় মুদ্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রাথের বন্ধু সমালোচক লোকেন্দ্রনাথ পালিত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর বিষয়ে আলোচনা সূত্রে সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এটা নিশ্চিত যে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মতো সমালোচক কোন জীবনের বাস্তব কথা কবিতায় তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন না। লোকেন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিও একই কারণে পছন্দ করেননি।

কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথের পছন্দ না হলে কী হবে, অন্যান্য অনেক পাঠকই সাধনায় মুদ্রিত পাঠটিকেই সমর্থন করেছিলেন। যেমন গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবিকে অনুযোগ করেছিলন প্রকাশিত গ্রন্থে কবিতাটির ওই কেরানি জীবনের কথা বাদ দেওয়ার জন্য। তরুণ প্রভাতকুমারের সেই চিঠি ছিল এরকম – "প্রেমের অভিষেক মাটি করিয়া দিয়াছেন মশাই? ইহার একটি উৎকৃষ্ট অংশ ছাঁটিয়া দিলেন কেন? আপনার এই ছাঁটা রোগের জন্য কি তারকেশ্বরে হত্যা দিব? অপোগণ্ড সাহেব শাবক কি অপরাধ করিল? যাহারা এটি নূতন পড়িবে তাহাদের কেমন লাগিবে বলিতে পারি না, কিন্তু যাহারা সাধনায় পড়িয়াছিল, তাহারা হায় হায় করিবে। আমি বলিয়া লিখিয়াছিলেন, চাকরি করিবার লজ্জার ভয়ে কি সেটুকু বাদ দিলেন?"

তরুণ পাঠকের এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দুদিন পরে (৬ চৈত্র, ১৩০২ব.) একটি পত্রে লেখেন – "প্রেমের অভিষেক কবিতাটি চিত্রা কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা যায় কারণ, ইহাই উহার আদিম রূপ। সাধনায় যখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল তখন কাহারও কাহারও মনে এতই আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার যো হইয়াছিল। তাহারা বলেন, কোনোও আপিস-

বিশেষের কেরাণী বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের উচ্ছাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখানো হয় - সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুন্ন নিরুপায় কেরাণীর মুখে একথাগুলো যেন কিছু অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মতো শুনায়; উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ব্ববিস্মৃত কবিতার মাটি থাকে না; ...” (দেশ’, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ব., পৃ. ১৭৫)।

‘মত্যর পরে’ কবিতাটি নিয়েও সেকালে অনেক আলোচনা হয়েছিল। সে সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে নিত্যকৃষ্ণ বসুর ‘সাহিত্য সেবকের ডায়ারি’ গ্রন্থে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার ‘রবীন্দ্রজীবনী’ তে লিখেছেন - “জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনায় ‘মৃত্যুর পরে’ কবিতাটি প্রকাশিত হইলে উহা কার উদ্দেশ্যে রচিত তাহা লইয়া বহু গবেষণা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাহার ডায়ারিতে বলেন যে কবিতাটি ‘সাধনা’য় বাহির হইলে, উহা বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদ সম্বন্ধে সন্দেহও তিনি প্রকাশ করেন। “উহার মধ্যে এত ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আছে যে তাহা বঙ্কিমের উপর প্রযুক্ত হইতে পারেনা।” আসলে ‘এত ব্যক্তিগত’ বলতে নিত্যকৃষ্ণ বসু যার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেই কাদম্বরী দেবী জীবিতকালে তত্তা বটেই, মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্র-সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা ছিলেন।

‘চিত্রা’-র কবিতাগুলি তঙ্কালীন পাঠক মহলে কতখানি আলোড়ন তুলেছিল, তার প্রমাণ রচনার পর থেকেই দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথকে কবিতাগুলির ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। ঔপন্যাসিক-গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্রে কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে ব্যাখন দিয়েছিলেন। কবিতাগুলি হল ‘প্রেমের অভিষেক’, ‘পূর্ণিমা’, ‘উর্বশী’, ‘জীবনদেবতা’ ও ‘সিন্ধুপারে’। চিত্রা’-র সব থেকে আলোচিত বিষয় জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতার স্বরূপ নিয়ে সেকালে তো বটেই, একালেও কম আলোচনা হয়নি। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনাকালে ভূমিকায় জীবনদেবতা সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। আবার রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম যথার্থ সমালোচক অজিকুমার চক্রবর্তী পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব সহকারে

জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই সমালোচকদের সামনে মডেল হয়ে উঠেছিল। জীবনদেবতা শ্রেণির কবিতা সম্পর্কে কী ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা? আমরা দু একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি –

১। "জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবনদেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বন করে যে অন্তর্যামীশক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলছেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে আশ্রয় করে হে স্বামিন, তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ? যা হতে চেয়েছিলে, যা করতে চেয়েছিলে, তা কি সব সম্পন্ন হয়েছে? আমার দ্বারা যা-কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই জীর্ণতা অসাড়তা ভেঙেচুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নতুন প্রাণ দাও, নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদি কালের চির পুরাতন বিবাহ বন্ধন নবীকৃত, করে দাও।

মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয়মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন; আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম – মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবনলীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মতো ছুটি লইলেন, আর-একজন কোন্ অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে। কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম, আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া, আরো, যেন অধিকতর ভালোবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।" গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ও চৈত্র, ১৩০২ব,

২। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে –

"উর্বশী যে কী, কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই অ্যাবস্ট্রাক । সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রসসঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উবর্শী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য – সেইজন্য

কোনো কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট সেলিযের চান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য সেইজন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইনটেলেকচুয়াল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয় – সে নিছক নারী, মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়, যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।" ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের আত্মপরিচয় অংশ। (বর্তমান আত্মপরিচয় গ্রন্থে মুদ্রিত)।

৩। "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।..

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।..

আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।"

৪।'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থে (পৃ. ৯০-৯১) জীবনদেবতা ভাবটির ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন - "... আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি, আর তারি

সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে যা - কিছু। যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন-জন-মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি, ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে। নাটকের স্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটা নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে... আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবনদেবতা শ্রেণীর কাব্যে।..

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেছে 'মনের মানুষ'।"

লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা পর্বে নানাভাবে জীবনদেবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাতে তার এই বিশেষ ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠকমহলে বিভ্রান্তি না সৃষ্টি হয়। অবশ্য একথাও সত্য যে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনদেবতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি এড়িয়ে যাওয়া অনেক পাঠকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে যখন আত্মপরিচয়ে কবিজীবনের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনার সূত্রে জীবনদেবতার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল এটিকে কবির আত্মপ্রশংসার ছদ্মবেশ ধরে নিয়ে কবির সঙ্গে কলহে জড়ালেন। শেষ পর্যন্ত 'আনন্দ বিদায়' প্রহসন লিখে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ পর্যন্ত করেন।

৮.৬ অনুশীলনী

১। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' সম্পর্কে কি অভিমত দিয়েছেন, আলোচনা করো।

৩।'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের পাঠ, পাঠান্তর ও গ্রন্থ পরিচয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখো।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – 'চিত্রা' এবং রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক বিশ্বভারতী, ৪র্থ সং ১৩৭৭ ৪র্থ সং ১৩৮৩, ৩য় সং, ১৩৯৭, ৩য় সং ১৪০১ব. (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড)

৩। প্রশান্তকুমার পাল - 'রবিজীবনী' (তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, ১৩৯৫ব.

৪। জগদীশ ভট্টাচার্য - কবিমানসী' (প্রথম খণ্ড) ভারবি, ১৯৯৭

৫। সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড) ইস্টার্ণ পাবলিশার্স,

৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৬ব:, ১৩৮৩ ব. ১৯৭৬ ৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী - রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিক্রমা', মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯০ব,

৬। প্রমথনাথ বিশী – 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ', মিত্র ও ঘোষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৭৩ব.

নীহার রঞ্জন রায় - রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, দি বুক এম্পোরিয়াম, ২য় সং ১৩৫১ব,

৭। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় - রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯, নূতন সংস্করণ ১৩৯৩ব.

৮। শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত - রবীন্দ্রনাথ', যতীন্দ্রলাল নন্দী, ১৩৪১ব,

৯। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য - রবিরশ্মি

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৪র্থ সং, ১৩৭২ব.

১১। ক্ষুদিরাম দাস - রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়', মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৬২

১২। ক্ষুদিরাম দাস - 'চিত্রগীতিময়ী রবীন্দ্রবাণী', বইপত্র, ১৯৮৪, সংশোধিত সংস্করণ

১৩। বুদ্ধদেব বসু - কবি রবীন্দ্রনাথ', দে'জ, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৩।

একক ৯ চিত্রা

বিন্যাসক্রম

৯.১ চিত্রা গ্রন্থের বিষয়বৈচিত্র্য

৯.২ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্র মানসিকতা

৯.৩ জীবনদেবতার ভাবনা

৯.৪ রূপকথার জগত থেকে অন্তর্জগতের বাস্তবতা

৯.৫ মর্ত্যপ্রীতিমূলক কবিতা ও এবার ফিরাও মোরে

৯.৬ সৌন্দর্যবোধের কবিতা ও উর্বশী

৯.৭ কাহিনীপ্রধান কবিতা

৯.৮ সারাংশ

৯.৯ অনুশীলনী

৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৯.১ বিষয় - বৈচিত্র্য

'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থটিকে রবীন্দ্র কবিতার সামগ্রিকতার বিচারে একটি পর্বের অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেই পর্বটি হল 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'চৈতালি' পর্ব। মানসী' থেকে 'চৈতালি'র রবীন্দ্র কবি মানস মোটামুটিভাবে একটি বৃত্ত সম্পন্ন করেছে। প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যবোধের গভীরতা থেকেই বিশ্বাত্মবোধের ব্যাকুলতায় এই পর্বের কবিতাগুলি যেন এক সূত্রে গাঁথা। বিশেষ করে কবির মানসী-প্রতিমা বা কাব্যলক্ষ্মীই

যেন জীবনদেবতা রূপে ‘চিত্রা’-য় বিস্তৃতি পায়। এই কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে জীবনদেবতার সত্তা ছাড়াও আরও নানা দিক আছে। সুকুমার সেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে দুই ভাবনার বিস্তার দেখেছেন –... একদিকে নিরাসক্ত নিবন্ধন সৌন্দর্যের উদাত্ত কল্পনা, অন্যদিকে জীবনের শ্রান্তি-ক্লান্তি হইতে মুক্তি কামনা, ...” অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশী ‘চিত্রা’-র কবিতা সম্পর্কে বলেছেন ‘চিত্রা’তে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ-জীবনের মত দুই দিকে প্রসার লাভ করিতেছে। এক দিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার মোচন করিতেছে, অপর দিকে বিশ্বকে, নানা দিক হইতে (সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব) নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে। মোট কথা ‘চিত্রা’-য় কবির ভাব-বিস্তার মূলত দুদিকে এক - সৌন্দর্য অনুধাবন, দুই - মর্ত্যপ্রীতি ও মানব প্রীতি। আমরা মূলত এই দুই বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখেও চিত্রার কবিতাগুলিকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি গুচ্ছে সাজিয়ে নেব।

প্রথম গুচ্ছ ও জীবনদেবতা বিষয়ক -

‘চিত্রা’, ‘অন্তর্যামী’, ‘জীবনদেবতা’, ‘সিন্ধুপারে’, ‘সাধনা

এই কবিতাগুচ্ছের কবিতাগুলি কবির জীবনদেবতা ভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম লেখা কবিতাটি ছিল ‘অন্তর্যামী', তার পরে ক্রমানুসারে লেখা হয়েছিল) সাধনা’, ‘চিত্রা’, ‘জীবনদেবতা’ ও সব শেষে ‘সিন্ধুপারে।

দ্বিতীয় গুচ্ছ ও প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা -

‘সুখ’, ‘জ্যোৎস্নারাত্রে’, ‘সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণিমা’, ‘আবেদন’, ‘প্রেমের অভিষেক’, ‘উর্বশী’, ‘রাতে ও প্রভাতে’, ‘বিজয়িনী’, ‘সান্ত্বনা’, ‘শেষ উপহার’, ‘গৃহশত্রু’, ‘উৎসব’ প্রভৃতি।

‘চিত্রা’-য় সৌন্দর্যভাবনার গভীরতাই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনও প্রকৃতি, কখনও প্রেমকে অবলম্বন করে কবির সৌন্দর্য-চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় প্রেম বিষয়টি একান্তভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন প্রেমের অভিষেক’, ‘সান্ত্বনা’, ‘শেষ উপহার’, ‘গৃহশত্রু’, ‘উৎসব’ - কবিতাগুলির মধ্যে প্রেম-

ভাবনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে, সৌন্দর্য-চেতনা এখানে গৌণ। অন্যদিকে 'সুখ', 'দিন শেষে' কবিতাদুটিতে প্রকৃতির বর্ণনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, সৌন্দর্য-চেতনার তত্ত্ব সেখানে নগণ্য। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রে', 'সন্ধ্যা', 'পূর্ণিমা, 'আবেদন', 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' একান্তভাবেই সৌন্দর্যভাবনার কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

তৃতীয় গুচ্ছ: মর্ত্যপ্রীতি ও মানব-জীবনের কথা -

এই গুচ্ছের মধ্যে ফেলা যায় 'এবার ফিরাও মোরে', 'নগর সংগীত', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', '১৪০০ সাল', 'নববর্ষে', 'প্রৌঢ়' প্রভৃতি কবিতাকে।

চতুর্থ গুচ্ছ ও কাহিনি প্রধান বা গল্প-কেন্দ্রিক -

'চিত্রা'র কয়েকটি কবিতায় একটি করে পরিপূর্ণ গল্পের আভাস লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই গল্পের কাহিনি মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং এক অর্থে কবিতাগুলি কবির মর্ত্যপ্রীতির কবিতা হিসেবেও চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু গল্প বা কাহিনিটিই এই কবিতাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে, তাই আমরা কবিতাগুলিকে কাহিনি প্রধান বা গল্প-কেন্দ্রিক কবিতা হিসেবেই দেখব। এই শ্রেণির কবিতাগুলি হল 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'শীতে ও বসন্তে'।

অবশ্য এখানে একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যেতেই পারে। বিষয় অনুসারে বিভাজন করা কতদূর সংগত? এই বিভাজনে করা কতদুর সংগত? এই বিভাজনের মধ্যে দিয়ে কবিতাগ্রন্থের সামিগ্রক ভাবব্যঞ্জনার গত এক্যকে কি অস্বীকার করা হয় না? একই কবিতাগ্রন্থ যদি বহু বছর ধরে, বভিন্ন পর্যায়ে লেখা হয়, তাহলে কবি-মানসের বিবর্তন অথবা ভাবনার বৈচিত্র্য সেই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত হতেই পারে। 'চিত্রা'-র কবিতাগুলি যদিও ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ এর মধ্যে লেখা, তবু এখানে কবির মানসিকতার পার্থক্য যে কবিতাগুলির মধ্যে ঘটেছে, তা বোঝা জায়।তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি লিখেছিলেন এক-এক সময়ে। যেমন ১৩০০ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত লেখা (জ্যোৎস্নারাত্রে' থেকে 'সাধনা') কবিতাগুলির সঙ্গে

১৩০১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের মধ্যে রচিত কবিতাগুলির পার্থক্য আছে। আবার ১৩০২ বঙ্গাব্দের অঘ্রাণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত লেখা কবিতাগুচ্ছটি ভাবগতভাবে মধ্যবর্তী কবিতাগুচ্ছের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এই মধ্যবর্তী সময়ের কবিতাগুচ্ছগুলি কাহিনি-কেন্দ্রিক। আরও একটা দিক হল কলকাতায় স্থিত অবস্থায় লেখা কবিতাগুলির সঙ্গে শিলাইদহ পতিসর-সাজাদপুরে লেখা কবিতাগুলির সূক্ষ্ম পার্থক্য।

বিষয়গত দিক থেকে আর একটি দিক উল্লেখ করার মতো। চিত্রা'-র কয়েকটি কবিতায় কবি স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়েছেন। যেমন 'স্নেহস্মৃতি', 'দুঃসময়' কবিতাদুটিতে স্মৃতির বর্ণনা আছে। আর দু-একটি কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে চিত্র বা ছবি। প্রকৃতিকে তিনি যেন কবিতার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন 'দিনশেষে', সুখ' বা 'বিজয়িনী' কবিতায়। সুতরাং 'চিত্রা'-র মূল ভাবটি জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যভাবনাকেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। ভাব ও বিষয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

'চিত্রা'-র বর্তমান এককের আলোচনায় আমরা এই কবিতাগ্রন্থটির সাধারণ পরিচয় ও কবিতাগ্রন্থটিকে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্যগত দিক আলোচনা করলাম আলোচনার প্রাথমিক ধাপে আমরা জানলাম 'চিত্রা'-র গ্রন্থ পরিচয়। কবিতাগুলি চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের থেকে শুরু করে ২০ ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। এই ১৩০২-বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন (১১ মার্চ, ১৮৯৬) গ্রন্থাকারে প্রকাশ। কিছু কবিতা কলকাতা-শান্তিনিকেতন-রামপুর-বোয়ালিয়ার রচিত হলেও অধিকাংশ কবিতা শিলাইদহ-পাতিসর-সাজাদপুরে থাকাকালীন লেখা হয়েছে। চিত্রা'-র এযাবৎ ছটি সংস্করণের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণে (কাব্যগ্রন্থাবলী-১৩০৩ব.) এবং তৃতীয় সংস্করণে (কাব্যগ্রন্থ-১৯১৫-১৬) বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে 'চিত্রা'-র শেষ সংস্করণ হয় ১৯৪০ এ (রবীন্দ্র রচনাবলী-৪)। চিত্রা'-এর বেশিরভাগ কবিতার পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। যেগুলির পাওয়া গেছে, সেগুলি মূলত 'M.S.129', 'মজুমদার পুঁথি'তে সংকলিত। কবিতাগুলির অধিকাংশই কেবল শব্দগত পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। তবে 'প্রেমের অভিষেক', 'মৃত্যুর পরে' , 'অন্তর্যামী' ও 'সিন্ধুপারে'-এ কবিতা-চতুষ্কের

গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর পাওয়া গেছে, যা কবিতাগুলির কিছু অচেনা দিক, কিছু নতুন ইঙ্গিতের প্রতি আলোকপাত করেছে।

'চিত্রা' গ্রন্থটি লেখার সময় বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ছিল সংকটময়। ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের প্রতি ছিল চরম উপেক্ষা-অবিচার, ছিল অপমানজনক দুর্ব্যবহার। পল্লিজীবন ছিল দারিদ্রের পাঁকে ডুবে। আর ১৮৯০ থেকে জমিদারি দেখাশোনার ভার পেয়ে রবীন্দ্রনাথও তখন শিলাইদহ পতিসর-সাজাদপুরে পল্লির বুকে প্রকৃতিতে নিমগ্ন ছিলেন। এই প্রকৃতির সান্নিধ্য ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের টানাপোড়েন 'চিত্রা'র বেশ কিছু কবিতায় উপস্থিত।

'চিত্রা'র বেশ কিছু কবিতা সেকালে সমালোচক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। 'প্রেমের অভিষেক' ও 'মৃত্যুর পরে' নিয়ে সমালোচকরা দ্বিধা-বিভক্ত ছিলেন। জীবনদেবতার স্বরূপ নিয়ে অনেক সমালোচক পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে এই শ্রেণির কবিতাগুলির ভাববস্তু ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কের গভীর অনুভূতিই জীবনদেবতার উপলব্ধি হয়ে উঠেছে।

'চিত্রা'-র কবিতাগুলি বিষয় অনুসারে চার শ্রেণির – জীবনদেবতা বিষয়ক, প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা বিষয়ক, মর্ত্যপ্রীতি বিষয়ক ও কাহিনি বা গল্পকেন্দ্রিক। অবশ্য এই শ্রেণিবিন্যাস ঐকান্তিক বিভাজন নয়, বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকলেও কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের ঐক্য বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতার প্রেক্ষিতে চিত্রা'-কবি-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতির পথে অন্যতম সোপান। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কবি-বৈশিষ্ট্য ও কাব্য-সাধনার সাধারণ লক্ষণগুলিও 'চিত্রা'-য় পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাই সমগ্র রবীন্দ্র-কবিতার প্রেক্ষাপটে চিত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

৯.২ 'চিত্রা' পর্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্র-মানসিকতা

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা'-র কবিতাগুলি লিখেছিলেন ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬-এর মধ্যে। এই কালপর্বটি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে তখনও স্বদেশি যুগ আসতে দেরি আছে, কিন্তু সেই আগামীর আগমনের বার্তা যেন শোনা যাচ্ছিল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই। ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বাংলার জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধ ও অধিকারবোধের জাগরণ দেখা দেয় প্রবলভাবেই। জাতীয় কংগ্রেসের দাবি ছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা প্রতিনিধিমূলক আইনসভা (Representative Government) গঠন করা। ইংরেজ ভারতবাসীর এই দাবি তো পূরণ করেইনি, উপরন্তু ১৮৯২-তে বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন-এর সময় নতুন ভারত - শাসন আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। বরং ব্যবস্থা - পরিষদের কয়েকটি আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করে হিন্দু - মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজসূত্র তৈরি করা হল। এর উপর উচ্চ পদের সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের অধিকারের দাবিকেও নির্লজ্জভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। মোট কথা ইংরেজের শাসন - প্রণালিতে ভারতীয়দের জন্য কোনাে সুবিচার ছিল না। আবার পল্লিগ্রামের দরিদ্র প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থাও সেই সময় চরম হয়েছিল। তার উপর শিল্পোন্নয়নের অজুহাত দেখিয়ে ইংরেজ সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দেশীয় বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক বসালে বাংলার ক্ষুদ্র বস্ত্র - নির্মাতা ও সাধারণ ক্রেতার নাভিশ্বাস ওঠে।

বাংলার এই আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে রবীন্দ্রনাথ খুব কাছ থেকে দেখার সুযোেগ পেয়েছিলেন। কেন না ১৮৯০-তে পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ে। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলি দেখার সূত্রে গ্রাম - বাংলার শ্রীহীন দরিদ্র প্রজাদের দুঃখ কষ্ট ও দুরবস্থার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল রবীন্দ্র - সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়।

দুভাবে। প্রথমত, এই পর্বে লেখা 'হিতবাদী', 'ভারতী' ও 'সাধনা'র বিভিন্ন ছোটোগল্পে। দ্বিতীয়ত, সাধনার যুগে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধে। ইংরেজ - শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রীতির অভাব ও ঘৃণার সম্পর্ক কতটা গভীর হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে সাধনায় প্রকাশিত ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'রাজা ও প্রজা' 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি প্রবন্ধে। ইংরেজ শাসকের স্বেচ্ছাচারিতা, 'নেটিভ'-দের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সুবিচারের অধিকার'-কেও কবি তুলে ধরলেন। এই বোধ থেকেই যেমন জন্ম নিয়েছে 'মেঘ ও রৌদ্র'র ইংরেজ পিটিয়ে কারাবরণ করা নায়ক শশিভূষণ। চিত্রা'-র জীবনদেবতার ভাবগম্ভীর পরিবেশে 'রসসম্ভোগের কুঞ্জকানন' ছেড়ে তাই রবীন্দ্রনাথকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে সুবিশাল কর্মক্ষেত্রে, বাস্তবের কঠিন মাটিতে। 'এবার ফিরাও মোরে' - কবিতার প্রেরণা ছিল এই আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক পরিস্থিতিই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে মধ্য তিরিশের কবির বিচিত্র প্রেরণাই 'চিত্রা'-র মূল সুরটিকে ধ্বনিত করেছে। 'মানসী', 'সোনার তরী'র প্রকৃতি ও সৌন্দর্যচেতনাই 'চিত্রা'য় পূর্ণ ও গভীরতর হয়ে জীবন-দেবতায় রূপ নিয়েছে। জগতের মাঝে বিচিত্র-রূপিনীকে নিজের অন্তরমাঝে অনুভব করার অন্তর রহস্যই 'চিত্রা'-র প্রধান প্রেরণা। আর সেই প্রেরণা ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে কবির প্রকৃতির শিলাইদহ, কখনও পতিসর, কখনও সাজাদপুর তো কখনও রামপুর বোয়ালিয়া, নিমগ্ন হয়ে থাকার মধ্যেই কবি এই পর্বের সৃষ্টি প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন। প্রাসাঙ্গিক ভাবে ছিন্নপত্রের একটি পত্রাংশ উদ্ধার করা হল। -

"আমার স্বীকার করতে লজ্জা হয় এবং ভেবে দুঃখ বোধ হয় - সাধারণত মানু উদ্ভ্রান্ত করে দেয়, আমার চারিদিকেই এমন একটা গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারিনে।" (পত্র - ১৫৬)

"আমি বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। কেন বলতে পারিনে। নিশ্চয় আমারই দোষ। স্বভাবটা বোধ হয় ক্রমশই কুনো এবং আত্মম্ভর হয়ে আসছে ..."

ভর করে সর্বদা দোদুল্যমান হওয়ার চেয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিভৃত হয়ে থাকায় সুখ না হাকে স্বস্তি আছে।" (চিঠিপত্র' - ৫, পৃ. ১৬৬ক) ।

চিত্রা পর্বের রবীন্দ্রনাথ নিমগ্ন হয়ে আছেন প্রকৃতির বুকে। এই প্রকৃতি এবং সংসার এই দুয়ের দোদুল্যমানতা একদিকে, অন্যদিকে দেশীয় রাজনীতি - এ সবের মধ্যে থেকেই চিত্রা পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসিকতাটি প্রস্তুত হয়েছিল। 'চিত্রা'-র কবিতাগুলি তাই রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

৯.৩ জীবনদেবতা - ভাবনা

'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থের সব থেকে আলোচিত, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জীবনদেবতা। এটি 'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থেই নয়, 'সোনার তরী', 'চিত্রা' পর্যায়ের এমনই সমগ্র রবীন্দ্র কবিতা সাধনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, 'চিত্রা' পর্যায়ে এর কথা প্রত্যক্ষভাবে এলেও 'চিত্রা'-র পূর্বে এবং পরবর্তীকালেও এই প্রসঙ্গটিকে নানা ইঙ্গিতে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। কবিদের অনেকের কবিত্ব-শক্তিই যে অলৌকিক প্রেরণা থেকে উদ্ভূত, তা পৃথিবীর বহু কবির ক্ষেত্রেই একটি স্বীকৃত সত্য। আদি কবি বাল্মীকি অথবা হোমার থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের কবিকুলের অনেকেই এমনকি আধুনিক যুগের কবি মধুসূদন পর্যন্ত এই প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী যখন এই ভাষায় বলেন – 'হাতে লইয়া পত্র মসী আপনে কলমে বসি । নানা ছন্দে লিখিলা সংগীত' - ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই দুটি পঙক্তি - 'মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ / মিলায়ে আপন সুরে।' আপাতদৃষ্টিতে কবির এই অনুভূতি কাব্য - প্রেরণার উৎস বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার অনুভূতির সঙ্গে একে এক করে দেখা চলে না। কেন

জীবনদেবতার অনুভূতি কবির কাছে ছিল একেবারেই নিজস্ব এবং অভিনব। শুধু কবির কবিত্বের প্রেরণাশক্তি নয়, ব্যাপকভাবে তা কবির সুখ-দুঃখ, ভাব-চিন্তা, কর্মজীবন, ইহকাল-পরকাল তথা জন্ম-জন্মান্তরের জীবনচেতনাকে পরিচালিত করেছে এই শক্তি।

রবীন্দ্রকবিতায় কখনও সে দেখা দিয়েছে অচেনা নাবিক হিসেবে, কখনও রহস্যময় অপরিচিত হয়ে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আবার কখনও 'বাল্যে খেলার সঙ্গিনী হয়ে বা যৌবনে 'মর্মের গেহিনী' 'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'-রূপেও কবির জীবন ও সৃষ্টিকে চালিত করেছে। এমনকি মৃত্যুর পরপারে নবজীবনেও কবি এই জীবনদেবতার দেখা পেয়েছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা - ভাবনার সঙ্গে আর কোনো কবির কবিত্ব-প্রেরণার তুলনা চলে না।কিন্তু প্রশ্ন, কে এই জীবনদেবতা, তার স্বরূপই বা কী ? এ নিয়ে সমালোচকদের প্রচুর আলোচনা - সমালোচনা আছে কিন্তু ঐকমত্য নেই। কারও ব্যাখ্যায় এই জীবনদেবতা গভীরতম অন্তরসত্তা কবির কাব্য প্রেরণার মূলশক্তি, কারও ব্যাখ্যায় তা অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত মহাচৈতন্যের নামান্তর। কখনও বা তাকে সৌন্দর্যবাদ বা নিসর্গ-অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আবার কারও ব্যাখ্যায় তা বিশ্বদেবতার নামান্তর। সমালাোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তবাদের সঙ্গে মিলিয়ে জীবনদেবতাকে দেখেছেন। আবার ক্ষুদিরাম দাস কবির ব্যক্তিচৈতন্য ও সমাজ-চৈতন্যের অনন্যোশ্রয়? - গত দ্বন্দের ভূমিকায় জীবনদেবতার স্বরূপ অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন। জীবেন্দ্র সিংহরায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তিবাদের আলোকে জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সব মিলিয়ে বিচিত্রভাবে, বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে। আমরা এই সমস্ত ব্যাখ্যার কেননাটিকেই অস্বীকার করতে চাই না, আবার কোনো একটি ব্যাখ্যাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাই না। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে রবীন্দ্রনাথের স্বয়ং এ ব্যাপারে কী বলেছেন একটু দেখে নেব।রবীন্দ্রব্যাখ্যার শুরুতেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো, রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেগুলি ঠিক এর স্বরূপটিকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দেয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তবে জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মোটামুটি 'মেটাফিজিক্যাল' বা আধ্যাত্মিক সত্তাটিকেই প্রকাশ করেছে। এই সত্তাই অনাদিকাল থেকে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়ে কবিকে বর্তমানের প্রকাশের মধ্যে উপনীত করেছে। এই সত্তাই কবির অন্তর্নিহিত সৃজনশক্তি রূপে 'জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান'

করছে। কবির রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরকে এক সূত্রে, গেঁথেছে এবং সেই সত্তার মধ্যে দিয়েই কবি বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেছেন। (আত্মপরিচয়')

জীবনদেবতার স্বরূপ উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা নির্দেশ বলা যেতে পারে কিছুটা গাইড লাইন দেওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতকেই আমাদের নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। জীবনদেবতা সম্পর্কে আর পাঁচজন পাঠক-সমালোচকের ব্যাখ্যার মতোই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাও একটি বিশিষ্ট মত। তবে এই ব্যাখ্যা অন্য সকলের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন-না তা রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশিষ্ট মানুষের সমালোচনা। তা ছাড়া তিনি স্বয়ং এই জীবনদেবতা তত্ত্বের স্রষ্টাও। এখনও আমরা জীবনদেবতা শ্রেণির কবিতাগুলির দিকে তাকাব। দেখব কবিতাগুলিতে কবি কা বলেছেন। প্রথমেই 'অন্তর্যামী' কবিতাটির কথা আসে। শুরুতেই কবি এক নারীর কল্পনা করেছেন যিনি কৌতুকময়ী। নিত্য নতুন কৌতুকে কবির উপর কর্তৃত্ব করছেন। অর্থাৎ কবি যেন মূলগত শক্তি রহিত। আর সেই নারী কাবকে সৃষ্টকর্মে চালনা করেছেন - 'অন্তর মাঝে বসি অহরহ / মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,/ মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ / মিশায়ে আপন সুরে।" যেন কবি তার সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় যা লিখতে চাইছেন, সেই নারী যেন তাকে এমনভাবে লিখিয়ে নিচ্ছেন যাতে ওই লেখা সেই অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত অসাধারণ সৃষ্টি হয়ে উঠছে - "যে কথা ভাবিনি বলি গেই কথা/ যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা/ জানি না এনেছি কাহার বারতা / কারে শুনাবার তরে।"

এই প্রথম স্তবক থেকে দ্বিতীয় স্তবকে পৌঁছে কবিতাটির মোড় ঘুরেছে। শুধু কবির সৃষ্টিকর্মেই নয়, জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখময়, কর্মময়, বাস্তব জীবনের চালিকা শক্তি হিসাবেও সেই নারীর ভূমিকা রয়েছে - 'যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে চলিতে দিতেছ কই?' অর্থাৎ যা ছিল কবির ব্যক্তিগত তা থেকে জীবনদেবতার ভূমিকা সামাজিক বা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেও নেমে, এল - "কভু বা পন্থ গহন জটিল, / কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল, / কভু সংকটছায়া শঙ্কিল বঙ্কিম দুরগম"।

পরবর্তী পর্যায়ে কবিতাটিতে এই অন্তর্যামী নারীকে কবি সৌন্দর্যময়ী, রহস্যময়ী করে দেখেছেন। এবং এখানে কবি এই নারীকে ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বচেতনার অসীমতায় এমনই জন্ম-জন্মান্তরের বোধে অনুভব করেছেন। "আমার মাঝারে করিছ রচনা / অসীম বিরহ অপার বাসনা / কিসের লাগিয়া বিশ্ব বেদনা/ মোর বেদনায় বাজে?" এই বোধ থেকেই কবি পৌঁছে গেছেন জন্মান্তরের চেতনায় যেখানে জীবনান্তেও প্রত্যক্ষভাবে ওই নারীর সাহচর্যলাভের বাসনা কবি করেছেন - "জনমে জনমে রহো তবে রহো,/ নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ/জীবনে জাগাও প্রিয়ে।"

ঠিক এই নৈকট্যই আরও নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে 'জীবনদেবতা' কবিতায়। অন্তর্যামী কৌতুকময়ী নারীই এই কবিতাতে পুরুষ হয়ে দেখা দিয়েছেন। 'জীবননাথ' অথবা 'প্রাণেশ' - সম্বোধন করে কবি এই অন্তরতমের সঙ্গে নিবিড় প্রণয়ের সম্পর্ক কল্পনা করেছেন ও তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম ও শান্তিকে এই দেবতার কাছে অর্পণ করেছেন। জীবন ও কর্মের সমস্ত বিকলতাগুলিকে অন্তরতমের পায়ে সমর্পণ করে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তার একান্ত প্রার্থনা - "নূতন করিয়া লহ আর বার । চিরপুরাতন মোরে - । নতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় / নবীন জীবন ডোরে।" - অর্থাৎ এখানেও জন্মান্তরের চেতনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যা প্রথমে ছিল কবির ব্যক্তিগত কল্পনার জগতে, তা থেকে জীবনদেবতা কবির সুখ-দুঃখময় বাস্তবের সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে এবং তা থেকেই ক্রমশ বিশ্বজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্বচেতনার সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সব শেষে কবির জন্ম-জন্মান্তরের চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্ব অস্তিত্বের চিরন্তন অসীমতায় পৌঁছে যাচ্ছে।

'চিত্রা'-র শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে -' তে সেই জীবনান্তরে অন্য লোকে জীবনদেবতার সঙ্গে কবির বহু অভীপ্সিত বাস্তব মিলনের কল্পনা-মদির ছবি আছে। জীবনদেবতা এখানে রহস্যময়ী মৃত্যুর দূত হয়ে কাবকে ইহজীবনের পরপারে, মৃত্যুর অজানা লোকে নববিবাহের মধ্যে দিয়ে কবিকে দেখা দিয়েছেন - "এখানেও তুমি জীবন দেবতা! কহিনু নয়নজলে / সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি - / ... এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!" বলা যেতে পারে, কল্পনার জগত থেকে বাস্তবের

বৃহত্তর জীবনে ও তা থেকে বিশ্বজীবন তথা জন্ম-জন্মান্তরের চেতনায় পৌঁছে যাওয়া কবির ‘ব্যক্তি আমি’ থেকে ‘বৃহত্তর আমি’ তে উত্তরণটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

জীবনদেবতাকে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসী শিল্পীসত্তা বা তার সৃজনীপ্রতিভা তথা কাব্যপ্রেরণার মূল শক্তি হিসেবে দেখতে চান, তাঁরা রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে কবির বক্তব্যটি এখানে তাদের কথাকেই সমর্থন করে বেশি। একথা ঠিক যে, জীবনদেবতা ভাবনার অনেকটা জুড়েই অন্তরতম দেবতার দ্বারা কবির সৃষ্টিজীবন চালিত হওয়ার কথা আছে। কিন্তু সৃজনীকল্পনার বাইরে যখন ‘সংকট ছায়া শঙ্কিল/ বঙ্কিম দুরগম’ বাস্তব পৃথিবীর কথা আসে, যখন জন্ম থেকে জন্মান্তরের ধারায় বিশ্ব অস্তিত্বের সঙ্গে চিরন্তনতায় ব্যাপ্ত হওয়ার কথা আসে, তখন কবির সৃজনীসত্তাটিকে বড়ো বেশি সীমায়িত মনে হয়। সৃজনীশক্তির অলৌকিকতা দিয়ে রবীন্দ্রভাবনার গভীরতাকে যেন ঢেকে রাখা হয়। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এই অলৌকিক সৃজনীশক্তি কি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে একবার মাত্রই এসেছিল ‘চিত্রা’ পর্বে?

জীবনদেবতাকে ‘মেটাফিজিক্যাল’ বা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে বিচার করাটাও ততখানি নিরাপদ নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তথা কবিতায় অধ্যাত্মভাবনা বলতে যা বোঝায় তা এসেছিল আরও পরে ‘নৈবেদ্য’, ‘গীতাঞ্জলি’- তে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ‘মেটাফিজিক্যাল’ বলতে ঠিক ওই অর্থে আধ্যাত্মিকতার কথা বলেননি। কেন না জীবনদেবতা — তাঁর আত্মপ্রকৃতির নিয়ন্তা হলেও তাকে কখনই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্তা হিসেবে কবি বর্ণনা করেননি। বরং কবি বলতে চেয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত বা আত্মগত আমির অতিরিক্ত আর এক সত্তার কথা, কিছুটা আত্মচেতনার মতো, বলা যেতে পারে Personality। কবির ব্যক্তি আমি এতদিন যে আত্মমগ্ন কল্পনায় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই সীমায়িত ছিল, তা যেন বাস্তবের সংঘাতে অন্যতর সত্তা বা শক্তি হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরাম দাস এভাবেই ব্যক্তি আমি’ ও ‘সমাজগত আমি’ - র অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় জীবনদেবতাকে দেখেছেন কবির ব্যক্তি আমি’র অতিরিক্ত আত্মবোধ - রূপে।

ক্ষুদিরাম দাস যাকে অতিরিক্তি আত্মবোধ বলেছেন, তা যখন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হচ্ছে, তখন ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও বিশ্ব-অস্তিত্ব একাকার হয়ে যাচ্ছে। জন্ম-জন্মান্তরের রূপ-রূপান্তরের বিবর্তন ধারায় এই দুইয়ের অস্তিত্বের সংযোগ যা কবি বলেছেন, তাকেই অজিত কুমার চক্রবর্তী ডারউইন-এর অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বব্যাখার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আবার এই অতিরিক্ত আত্মবোধের চরম সত্তাকে হিন্দু-দর্শনের অদ্বৈতবাদ বা উপনিষদের জন্মান্তরবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তা কখনই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার সমর্থক হয়ে ওঠে না। ' আসলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কোনো নব উদ্ভুত তত্ত্ব বা দর্শন নয়। রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ তত্ত্ব হিসেবে এর প্রবর্তন করেননি।কবির ব্যক্তিজীবন তথা 'আত্মগত আমি'- র সঙ্গে বি জীবনদেবতার মূল বলে মনে হয়। কবি হিসেবে এতদিন তিনি ছিলেন ব্যাও সীমার জগত থেকে এবার তিনি তাকিয়েছেন বিশ্বজীবনের অসামতা অন্যদিকে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনু-পরমাণুর সঙ্গে সেই ব্যক্তিগ সম্পর্কই জীবনদেবতা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন খণ্ডিত, তেমনি তার অস্তিত্বের চেতনার দ্বান্দ্বিক মাতত্বও পূর্ণ নয়। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি অস্তিত্ব থেকে সমষ্টির অস্তিত্বের সে সম্পর্ককেই সুতরাং জীবনদেবতা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

জীবনদেবতার ভাবনায় রবীন্দ্র-কবিমানসের ধারাবাহিক ইতিহাসের একটি বিশে। একে নিতান্ত কবির খেয়ালি কল্পনা বলা যাবে না, আবার বিশেষভাবে তত্ত্বের দর্শনের তত্ত্বরূপের কবিতাও বলা যাবে না। জীবন-মৃত্যু; ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও বিশ্ব-আতধে মানব-জীবনের যে চিরন্তন অস্তিত্ব বর্তমান - সেই আদি-অন্তহীন অস্তিত্বই জীবনদেবতা। তাত্ত্বিক-কল্পনাবোধের গদ্যময়তা নয়, ছন্দের হিল্লোলে, অলংকারের জ্যোতিতে, বাক্-প্রতিমার ইন্দ্রজালে এ অনবদ্য মিলনে জীবনদেবতা শ্রেণির কবিতাগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

৯.৪ 'সিন্ধুপারে' রূপকথার জগৎ থেকে অন্তর্জগতের বাস্তবতা

'সিন্ধুপারে' কবিতাটি আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন - "এই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা, যেখানে কীটস অথবা কোলরিজের মততা, তিনি চেয়েছিলেন ত্রাস ও রহস্যকে মেলাতে;" (কবি রবীন্দ্রনাথ')। রূপকথার আবরণ ও রোমান্টিক কবিতাটির প্রাণ। সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছেন - "কবিতাটি পড়িলে মনে হয় যেন রূপকের স্ফটিক পাত্রে রূপকথার উজ্জ্বল রস উছলিয়া পড়িতেছে।" বস্তুত, রূপকথা ও রহস্যময়তাকে সৃষ্টির উপাদন হিসেবে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই ব্যবহার করেছেন। শেকসপিয়র, কিট্স বা এগার অ্যালান পো - এর মতো রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। বরং তার বেশ কিছু গল্প ও কবিতায় রোমান্স ও রূপকথার উপাদান ব্যবহার আমাদের চমকিত করে। তবে নিছক রূপকথার গল্পকথা শিশুসাহিত্যে চলে। আসল কথা রূপকথার রূপকের আবরণে অভিপ্রেত বক্তব্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই কবি ও কবিতার সার্থকতা। সেদিক থেকে 'সিন্ধুপারে' কবিতায় যে রোমান্স ও রূপকথার জগৎ, নির্মিত হয়েছে, তার পরিণতি কি নিতান্ত রোমান্টিক সুদুর - কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, নাকি তার আবেদন আরও গভীরে, রূপকথার জগৎ থেকে অন্তর্জগতের বাস্তবতায়?

"সন্ধ্যাবেলা জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলাে়য় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতম রূপকথা।" (আত্মপরিচয়')। রূপকথার জগৎ এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় নিহিত হয়ে গিয়েছিল ছেলেবেলা *থে*কেই। কিন্তু রূপকথার রোমান্টিকতা কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয় নিতান্ত শিশু সাহিত্যের রূপকথার জগৎ হয়ে থাকতে পারে না, তা সে শিশুদের জন্য লেখা - শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' - কবিতাগ্রন্থই হোক না কেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশুপাঠ্য গল্পের রূপকথারা একান্তভাবে শিশুদের মনের রূপকথার কে . থেকেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' সে দিক থেকে শিশুমনের রূপকথার রহস্য-খাে়রাক

জুগিয়েও রূঢ় বাস্তবতার বিপ্রতীপে এক বিকল্প জগত নির্মাণ করেছে। বাস্তবের ঘেরাটোপ ভেঙে ফেলা সেই বাস্তবাতিশয়ী রূপকথার জগৎকে বলা যায় ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা। অবশ্য এই ধরনের ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতায় থাকার কথা নয় এবং তা নেইও। 'সিন্ধুপারে' কবিতার আপাত রূপকথার জগতের অন্তরালে রয়েছে কবির জীবনরহস্যের সন্ধান। এই জীবনরহস্য চিত্রা পর্বে জীবনদেবতা-ভাবনাকে ঘিরেই। আলোচনা-সুত্রে আমরা দেখতে পাব কীভাবে জীবনদেবতা-ভাবনার বলয়টি 'সিন্ধুপারে' কবিতায় সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এখন কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কবিতার শুরু শীত-রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে একটি নিদ্রিত পুরীতে সুখনিদ্রার ঘাোরে মগ্ন কবির কথা দিয়ে। পরিবেশ বর্ণনাতে গা-ছমছমে রহস্যময়তা এসেছে - "ঝিল্লিমুখর রাতি/ নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ রাতি।" এমন সময় এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাইরে থেকে সহসা কবিকে নাম ধরে কে যেন ডাকে। তীক্ষ শাণিত তীরের মতন' সে স্বর কবির মর্মে গিয়ে বাজে। রোমাঞ্চকলেবর হয়ে দুরুদুরু বুকে বিছানা ছেড়ে বিরল বসনে কবি দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ান। দেখেন অবগুণ্ঠনে ঢাকা এক রমণীমূতি কালো ঘোড়ার সওয়ারি হয়ে বসে রয়েছেন। ধূবরণ অন্য একটি ঘোড়া রয়েছে দাঁড়িয়ে। রহস্যময়ী রমণীর অঙ্গুলি ইশারায় মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম' কবি সেই ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। শুরু হল এক রূপকথার জগতে যাত্রা।

বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটে চলে – 'লক্ষ্যবিহীন তীরের মত।' ঘোড়ার পা যেন মাটি স্পর্শ করে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা-'। যেন রূপকথার তেপান্তর পেরিয়ে চলেন কবি। মাঝে মাঝে যেন চেনা - চেনা মতো মনে হয়', অভিভূত মন্ত্রমুগ্ধ কবির মনে তখন দ্বিধা -

এ 'দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?

অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল?"

কবি শুধু মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন রমণীটির অবগুণ্ঠিত মুখ। প্রাণ যেন কেঁপে ওঠে। কবির মুখে কথা নাহি ফুটে। ভয়ে তিনি ভুলে যান দেবতার নাম।

অবশেষে ঘোড়া এসে থামল এক নির্জন সমুদ্রতটে। তখনও সকাল হয়নি - 'সাগরে না শুনি জলকলরব, গাহে উষার পাখি' ঘোড়া থেকে নেমে সেই অবগুণ্ঠিতা কবিকে নিয়ে গেলেন গুহা প্রাসাদের অভ্যন্তরে। আশ্চর্য এই গুহা প্রাসাদ, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের আশ্চর্য সৃষ্টির মতো। গায়ে তার. চিত্রিত পাষাণ মূর্তি, মাঝখানে চাঁদোয়া টাঙানো, মুক্তার ঝালর দেওয়া। মাঝে একটি মণিপালঙ্ক 'অমল শয়ন পাতা'। ধূপধার থেকে ধূপের গন্ধ আসছে। সেখানে নেই কোনো প্রহরী, অথবা দাসদাসী। এমন সময় সেই নারী পালঙ্কের অমল শয্যায় বসলেন এবং কবিকেও পাশে বসালেন। ভয়ে-রোমাঞ্চে কবির সর্বশরীর হিম হয়ে এল। 'শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।'

সহসা দশ দিকে বেজে উঠল বীণাবেণু। ঝরে পড়ল পুষ্পরেণু। দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল দীপের আলোকরশ্মি। আর সেই রমণীর মধুর উচ্চ হাসিতে সমস্ত গাম্ভীর্য যেন ভেঙে গেল। তারপরে চলল বিবাহের আয়োজন। রমণী সোনার দণ্ড নিয়ে মাটিতে আঘাত করা মাত্রই চারদিকে শত শত শঙ্খ উঠল বেজে, হুলুধ্বনি ব্রাহ্মণও উপস্থিত হল ধানদূর্বা হাতে। তার পিছনে দুই সারি কিরাতনারী কেউ বা মালা, কেউ বা চামর, কেউ বা তীর্থজল নিয়ে দাঁড়িয়ে। বুদ্ধ গণক লগ্নকালও ঘোষণা করলেন।

যেন রূপকথার বিবাহবাসর। কবির সম্মতি-অসম্মতি জানানোরও কোনো সুযোগ নেই। পুরোহিতের মন্ত্র পড়া শেষ হতেই- "অজানিত বন্ধু নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর / হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।"

বিবাহ শেষ হল। এরপর বাসর - ঘরের দৃশ্য। অনেক দীর্ঘ আঁধার কক্ষ পেরিয়ে অবশেষে কবি দেখলেন বাসর সজ্জা - "কনকে রজত রতনে জড়িত বসন বিছানো কত", "মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্নরচিত মতাে।" সেই রমণী বসলেন সেই পাদপীঠে, চরণ ছড়িয়ে। আর এতক্ষণে কবি প্রথম কথা বললেন - সব দেখিলাম, তাোমারে দেখিনি শুধু। সেই মুহূর্তেই চারিদিক থেকে শত ফোয়ারার যেন কৌতুক - পরিহাস উচ্ছলিত হয়ে পড়ল। দু-বাহু তুলে সেই রমণী এতক্ষণে তার অবগুণ্ঠন তুলে ধরে মধুর হাসি হেসে উঠলেন। আর তারপরেই কবির বিস্ময় - 'এখানেও 'তুমি জীবনদেবতা! কহিনু নয়ন জলে।" , রূপকথার অপরূপ রাজ্য থেকে কবি এ কোথায়

এসে পড়লেন? রমণীর অবগুণ্ঠন তালো পর্যন্ত । কবিতাটির সর্বাঙ্গে ছিল রূপকথার অপরূপ দ্যুতি। কবির শেষ কথাটি বলার আগে পর্যন্ত কবিতাটি রূপকথার রহস্যকলা মাত্র ছিল। অথচ শেষ পরিণতিতে কবিতাটি রূপকথার জগৎ থেকে কবির অন্তর্জগতের আর এক বাস্তবে এসে পড়েছে। ঠিক এরকম আকস্মিক পট-পরিবর্তন কি আমরা আশা করেছিলাম? হয়তো না। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, জীবনদেবতার স্বরূপ প্রকাশই যদি কবিতাটিতে কবির লক্ষ্য হয় তাহলে এত রহস্য - রূপকথার রোমান্সের আয়োজনের প্রয়োজন কী ছিল। সমালোচকদের কারও কারও কাছে এই পরিণতি 'অতিনাটকীয়, অপ্রাকৃত-আতঙ্ক কণ্টকিত অন্তিম যবনিকাপাত'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন- "অবশ্য কবিকল্পনা ভাবাষঙ্গ - উদ্বোধনে অসাধ্য - সাধন করিয়াছে; কিন্তু আয়াস-নির্মিত বেদীর সহিত উহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার অসামঞ্জস্য কবির অঘটন – ঘটন - পটীয়সী শক্তির দ্বারাও দূরীভূত হয় নাই।" (রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা -১)

আপাতভাবে সমালোচকের *এই* বক্তব্য হয়তো ঠিক। স্ফটিকের উজ্জ্বল পাত্রে রূপকথার উজ্জ্বল রস যতখানি উচ্ছল হয়ে পড়েছে, সেই তুলনায় কবিতাটির এমন আকস্মিক তাত্ত্বিক পরিণতি কিছুটা বিসদৃশ লেগেছে। কিন্তু এটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে যে, রূপকথার রহস্যময় গল্প কথা দিয়েই যদি এ কবিতা শেষ হত তাহলে তা হয়ে উঠত নিছক ছেলেভোলানো রূপকথার রোমান্টিকতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই সাধারণ পরিণতিও আমাদের কাঙিক্ষত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেই নিছক রোমান্টিক রস পরিণতিতে কবিতাটি শেষ হয়ে যায়নি, কবির অন্তর্জগতের বাস্তবতা ছুঁয়ে জীবনদেবতার - ভাবনাকে পূর্ণতা দিয়েছে। অন্তর্যামী কবিতায় যে কৌতুকময়ী নারীকে কবির ব্যক্তিজীবনের সৃষ্টিশক্তি সহ সুখ-দুঃখময়কর্মময় বাস্তবজীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে পেয়েছি, তাকেই আবার দেখেছি ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বচেতনার অসীমতায় এমনকি জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কে কবির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে। জীবনদেবতা কবিতায় তাকেই দেখেছি 'পুরুষ' রূপে কবির পরকালের জীবনকেও চালিত করতে। কবিতাটির শেষ চারটি পংক্তি ছিল -

"নূতন করিয়া লহো আর বার।

চিরপুরাতন মোরে –

নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়

নবীন জীবনভোরে।

এই যে নবীন-জীবনেও 'নূতন বিবাহে' বাঁধার প্রার্থনা কবি জীবনদেবতার কাছে জানিয়েছেন, সেই পরজনমের সম্পর্কের বৃত্তটিই সম্পূর্ণ হয়েছে 'সিন্ধুপারে' কবিতায়। ইহজীবনের পালা সাঙ্গ করে নবজীবনের মধ্যে দিয়ে কবি জীবনদেবতাকে পেয়েছেন। এই যে আদি - অন্তহীন আত্মিক অস্তিত্ব কবির পূর্ব-জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরপারেও বিস্তৃত হয়েছে - এই পাওয়ার মধ্যে দিয়েই যেন কবির আত্মিক-অস্তিত্বের পূর্ণতা ঘটেছে। সে দিন থেকে 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে যেন রূপকথার রসে জারিত করে জীবনদেবতার আদি-অন্তহীন আত্মিক অস্তিত্বকেই মৃত্যুর পরপারের জীবনে দেখানো হয়েছে।

যেহেতু মৃত্যুর পরপারের নবজীবনের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাই সেই জীবনকে বর্তমানের বাস্তব করে আঁকা যেতো না। মৃত্যুর পরপারের জীবন আমাদের কাছে রূপকথারই জীবন, পুরাণেও আছে বৈতরণীর ওপারে মৃত্যু পারের কথা। কাজেই সেই জীবনের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে কবিকে রূপকথা ও রোমান্সের আয়োজন করতে হয়েছে। কবিতাটির পরিবেশ নির্মাণে, রূপকথার রহস্যময় আবহ তৈরিতে যে বাক-প্রতিমা ব্যবহৃত হয়েছে, তা অতুলনীয়। ভাষায়-ছন্দে- অলংকারে, রোমান্সীয় কবি কল্পনার সঙ্গে তত্ত্বভাবনার আশ্চর্য। সমন্বয়ে সিন্ধুপারে একটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে।

৯.৫ মর্ত্যপ্রীতিমূলক কবিতা ও 'এবার ফিরাও মোরে'

'চিত্রা'-র জীবনদেবতা-ভাবনা ও সৌন্দর্যবোধের কবিতাগুলির পাশাপাশি কিছু মর্ত্যপ্রীতি তথা মানবপ্রীতিমূলক কবিতাও আছে, যা এই কবিতা গ্রন্থে কবি মানসিকতার ভিন্নতর দিককে ফুটিয়ে তোলে। কেন-না – 'মানসী' - 'সোনার তরী' - 'চিত্রা' পর্বে কবি মূলত

রিয়াল-আইডিয়ালের দ্বন্দ্ব এবং এ দুয়ের অখণ্ড সামঞ্জস্যবোধের এক অসীম রোমান্টিকতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই রোমান্টিক কবি-কল্পনার দিকটা এই পর্বে এতটাই প্রবল ছিল যে, কবি শুধুই অসীমের কল্পনা ও ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করেছেন – এমন সমালোচনা ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু অসীমবিলাসী ভাব-কল্পনার কবি শুধু ঔপনিষদিক ভাব-বিস্তারী কবি ছিলেন না। জীবনের সংকটে কোনো কবিই কল্পনার ভাবলোকে মগ্ন থাকতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও পারেননি। বাস্তবে পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, নৈরাশ্য-সংকটের ছায়াপাত বারে বারে তাঁর কবিকল্পনাকে মর্ত্য-জগতে নামিয়ে এনেছে। 'চিত্রা' রবীন্দ্র-কবিতার ধারায় এই কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, এখান থেকেই রোমান্টিক কবি কল্পনার জগৎ *থে*কে বাস্তব পথিবীর মানব-জীবনের দিকে তাকিয়েছেন। চিত্রা - র – 'এবার ফিরাও মোরে' নগর সংগীত', 'শীতে ও বসন্তে' প্রভৃতি কবিতার সেই দৃষ্টির রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট খুঁজতে গেলে 'চিত্রা'- সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে আর একবার স্মরণ করতে হবে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী বাংলায় রাজনৈতিক সচেতনতা, সেই পর্বে অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ভারতবাসীর উপর ইংরেজ শাসকের শোষণ অত্যাচার, অবিচার ও অপমানজনক ব্যবহারও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ১৯৯০-এ জমিদারি দেখাশোনার সূত্রে পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক সংকটের আবর্ত থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নেননি। 'সাধনা' - তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক রাজনৈতিক- সামাজিক প্রবন্ধই এই সময়ের সৃষ্টি। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'রাজা ও প্রজা', 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ এবং উভয়ের সম্পর্কে প্রীতির অভাব ও ঘৃণার পরিবেশ কতটা গভীর হয়েছিল তা জানা যাবে। শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার, 'নেটিভ' দেশবাসীর প্রতি অপমানজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে এই সময় লিখেছেন - সুবিচারের অধিকার' ও

'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধ দুটি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ শুধু আকাশবিস্তারী রোমান্টিক কবিকল্পনাতেই মগ্ন ছিলেন - এ অভিযোগ মিথ্যা। বরং প্রবন্ধের মতো কবিতাতেও তিনি জনচিত্ত উন্মোচন কাজটি করেছিলেন। যেহেতু 'চিত্রা' থেকেই কবি-কল্পনা সৌন্দর্যলোক থেকে মাটির পৃথিবীর দিকে নেমে এসেছে, তাই এই কবিতাগ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্র-কবিতার দিক পরিবর্তন ঘটেছে বলা যেতে পারে এবার ফিরাও মোরে কবিতাটির কথা।

কবিতাটির শুরুই হয়েছে কর্মব্যস্ততার কথা বলে- সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত এই কর্মরত মানুষদের জীবন একদিকে, অন্যদিকে রয়েছে কবির কবিতা-চর্চার জগত। কবি যেন নিজের কাব্যচর্চাকে ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো মাঠে মাঝে কর্মহীন বাঁশি বাজানোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর এই কর্মহীনতার জগত থেকেই বাঁশি বাজানো বন্ধ করে নিজেকে তিনি নিয়ে যেতে চান সেই কর্মমুখর জনতার মাঝে, যেখানে -

'স্ফীতকায় অপমান।

অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান

লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস .

স্বাথোর্দ্ধত অবিচার"

নতশির, মূক এই মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অভিনব বইকি! যারা শোষিত, অবহেলিত শত শতাব্দী ধরে, যারা দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে আর শোষণ-বঞ্চনার মহাভার বংশ বংশ ধরে চাপিয়ে রেখে যায় সন্তানদের উপর।

কিন্তু কবির কাজ কী? কবি নিশ্চয় এই শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে মিশে প্রতিবাদের মিছিল বার করবেন না বা শ্লোগান রচনা করবেন না। রাজনীতির মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া বা সমাজ গঠনের সেবাব্রতে চরকার সুতো কাটাও কবির কাজ নয়।

কবি যা পারেন, তা হল নিজের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জ্ঞর মঙ্গল সাধন করা। ১৯১৭তে লেখা আমার ধর্ম প্রবন্ধে (আত্মপরিচয়' গ্রন্থ) এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি লিখেছেন

"যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বে পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয় আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙক্ষাটি 'চিত্রায় এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ। ... অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পেছিয় সে তো বাশির ললিত সুরে নয় ... এ আহ্বান তো শক্তিতেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।"

তাহলে কবি কর্মক্ষেত্রে যে শক্তির আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন তা, কবির কাছে এক ধরনের শ্রেয় বাোধ। প্রকৃতপক্ষে কবি এখানে কবিকর্মী হয়ে শাশ্বত মৌলিক কিছু সৃষ্টি করবেন যা মানুষের জগতকে দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে। এই আদর্শবোধকেই কবি বলেছেন শ্রেয়। আর এই শ্রেয় বোধ থাকলেই মানুষ ক্ষুদ্র আমি'র স্বার্থ ত্যাগ করে 'বৃহৎ আমি'র বৃহত্তর সত্যের লক্ষ্যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারে। বলা যেতে পারে এই লক্ষ্যপথই 'প্রিয়'। শ্রেয়কে আশ্রয় করে সেই প্রিয়কে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কবিতাটির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

তাহলে কবির কাজ কবিকর্মী হয়ে মানুষের জন্য কিছু সৃষ্টি করা, যা মানব জীবনকে উদ্বুদ্ধ করবে। শ্রেয় বা আদর্শববাধে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাই নতশির মূক মানুষদের শোষণ-বঞ্চনার কথা বলার পর তিনি বলেছেন

"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে

দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন- বুকে

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—

মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,"

কাজেই কবি তাঁর প্রাণশক্তি নিয়েই সমষ্টির মাঝে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন। নিজের শ্রেয় বাোধের মধ্যে দিয়েই স্বর্গ থেকে নিয়ে আসবেন বিশ্বাসের ছবি, এটাই হবে তাঁর সব চেয়ে বড়ো দান।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে কবি নিজের অন্তরবাসিনী প্রেরণাদাত্রীর কাছে সেই শ্রেয়বোধই কামনা করেছেন 'এবার ফিরাও মোরে,' লয়ে যাও সংসারের তীরে। আর তাই 'বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়া' ত্যাগ করে কবি বার হয়েছেন- 'উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর প্রসর রাজপথে/ জনতার মাঝখানে।"

এর পরবর্তী অংশে কবিতাটিতে কবির আদর্শ বা শ্রেয়বোধের জগৎপ্রাধান্য পেয়েছে। আত্মসুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্নতার জগৎ হল জীবন থেকে পলায়নের জগৎ। এই জগৎ থেকেই বেরিয়ে আসতে হবে বৃহৎ জগতে এবং -

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যের করিয়া ধ্রুবতারা।

মৃত্যুর না করি শঙ্কা।"

সত্যের আদর্শই জীবনের শ্রেয়বোধ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সেই শ্রেয়রূপী স্বতন্ত্র সত্তা। তিনি আমাদের নিরন্তর আহ্বান করছেন। আর যে শুনেছে কানে সেই আহ্বানগীত

"ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে

সংকট আবর্ত-মাঝে দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সংগীতের মতো।"

অন্তরতম এই আদর্শসত্তার ডাক শুনেই বুদ্ধদেব একদিন রাজবেশ ছেড়ে ঘর-সংসার ত্যাগ করে বিবাগী পথের ভিক্ষুক হয়েছিলেন। সমস্ত অপমান, লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করেও যিশু ঔদার্যতার শ্রেষ্ঠতম । শিক্ষা মানুষকে দান করে গেছেন। মানবজাতির মঙ্গল কামনায় তাঁদের এই আত্ম উৎসর্গ কখনও বৃথা যায় না।তাঁদের দানের সার্থকতা জীবনে থেকে যায়। তাই তাঁদের অমরত্বের স্বীকৃতি কবির কলমে "তাহারি উদ্দেশ্যে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে।"

বস্তুত, শ্রেয়বোধের আদর্শেই কবি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন মানুষকে, নিজেকে। তিনি বিশ্বাস করেন, ক্ষুদ্র 'আমি'কে বলিদান দিয়ে জীবনের সমস্ত অপমানকে দূরে বর্জন করে সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলে। তাহলেই সেই মঙ্গলবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষটি যখন দীর্ঘপথ শেষে জীবনযাত্রার অবসানে রিক্ত হয়ে ফিরবেন, তখন তাঁর জয়ের স্বীকৃতি দিতে চিরকালের জীবনলক্ষ্মী তাঁকে পরিয়ে দেবেন বরমাল্য। এইভাবেই শ্রেয়কে তথা শ্রেয়োবোধের পথকে অবলম্বন করে প্রিয়কে লাভ করা যাবে।

কবিতাটির শেষে জীবনলক্ষ্মীর আদর্শ ও সৌন্দর্যের ব্যাপ্ততায় যে প্রবল ভাবাবেগ দেখা দিয়েছে, তাতে যেন প্রথম অংশের সঙ্গে সামান্য হলেও সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়। তবে কবিতাটি মোটেও নিছক রোমান্টিক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। শুরুর বাস্তব পৃথিবী আসলে কবিকে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনার ক্ষুদ্র জগৎ থেকে বৃহত্তর জগতে নিয়ে গেছে। যেন বাস্তবের কন্টাকিত জীবনের পথ বেয়েই কবি অন্তরের শ্রেয়োবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর এই শ্রেয়োবোধ অবলম্বন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্নতার জগত ছিন্ন করেছেন এবং জীবনের শেষে লাভ করেছেন প্রিয়কে। বলা চলে কবিতাটি আইডিয়াল থেকে রিয়াল, এবং রিয়াল থেকে আইডিয়াল— এ দুয়ের এক অপূর্ব সামঞ্জস্যবোধের কবিতা। এই সামঞ্জস্যবোধের মধ্যেই আমরা পাই এক কবি-কর্মীকে যিনি কল্পনার রোমান্টিক জগত থেকে নেমে এসেছেন বাস্তবের মাটিতে, অথচ তাঁর রোমান্টিক আদর্শবোধের আলোকেই কবি-কর্মী হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

৯.৬ সৌন্দর্যবোধের কবিতা, উর্বশী

'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় কবিচিত্তের সুগভীর সৌন্দর্যবোধে। ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন— "এখানে দেখা যায় কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা স্থির সৌন্দর্য - অনুধ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে, মর্ত্য উপলব্ধির আগ্রহ সাধারণ সর্বপ্রীতিকে অতিক্রম করে বিশেষ ও বাস্তব মানবপ্রীতির চরিতার্থতায় উপনীত হয়েছে, ..।" অবশ্য এই সৌন্দর্য ব্যাকুলতা 'চিত্রা'র আগে 'মানসসুন্দরী' থেকেই দেখা গিয়েছিল। সুরদাসের প্রার্থনা'য় যে দেহহীন জ্যোতিরূপ সৌন্দর্যময়ীকে অনুভব করার কথা ছিল, সেখানে সৌন্দর্য প্রেরণায় চঞ্চলতাই বেশি ছিল। অন্যদিকে ছিল সেই সৌন্দর্যের ধ্যানময় সমাহিত রূপ। এই সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা এবং শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন উপলব্ধিই চিত্রা'র এক শ্রেণির কবিতায় লক্ষ করা যায়। নাম কবিতা 'চিত্রা'য় যাকে আমরা জগতের মাঝে বিচিত্ররূপিনী', দ্যুলোকে ভূলোকে চঞ্চলগামিনী' রূপে দেখি, তাকেই আবার ধীর গম্ভীর, গভীর মৌন মহিমায় অনিমেষ মূরতি' হয়ে কবির অন্তরমাঝে 'অন্তরবাসিনী' হতে দেখি।।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনার একটি স্বকীয় তাত্ত্বিক চেহারা আছে, যা কবি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য শিল্প সৌন্দর্যের সত্য মূর্তিকে ফুটিয়ে তোলে। এই সৌন্দর্য। শুধু বহিঃপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোহনীয়তায় নয় তার সঙ্গে আছে ইন্দ্রিয়-অনুভব নিরপেক্ষ অন্তরের এক বিশেষ সত্য উপলব্ধি। এটিই স্রষ্টার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বোধ যাকে কি বলেছেন- 'Beauty is truth, truth beauty', সেই সুন্দর ও সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড ঐক্যের আদর্শে দেখেছেন। অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— "আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা কিছু জানি, কোনো না কোনো ঐক্যসূত্রে জানি, এবং যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর।" বস্তুত, কবির সৌন্দর্যবোধ এক ঐক্যবোধের প্রেরণা থেকেই এসেছে। 'চিত্রা'র বেশ কিছু কবিতায় সৌন্দর্যবাোধের এই পরিচয়ই পাওয়া যায় নানাভাবে ও ভঙ্গিতে।

'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতায় নিস্তব্ধ পূর্ণিমা যামিনীর মধ্যে কবি কামনা করেছেন সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অসীম সুন্দর, ত্রিলোকনন্দনমূর্তি'যে। বাসনার তীরে বসেই কবি তাঁর হৃদয়ের অজ্ঞাত দেবতার জন্যে চিররাত্রিদিন অঘ্যর্ভার নিয়ে এসেছেন। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কাছে তাই তাঁর প্রার্থনা কোনো মর্ত্য দেখে নাই "যে দিব্য মূরতি আমারে দেখাও তাই / এ বিশ্বব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।" 'পূর্ণিমা' কবিতায় গ্রন্থের কালো অক্ষরের তত্ত্বকথা ছেড়ে সৌন্দর্যের পূর্ণরূপটি পেয়েছেন নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে। সৌন্দর্যকে তত্ত্ব দিয়ে, জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চার মধ্যে দিয়ে অনুভব করার ব্যর্থ প্রয়াস থেকে মুক্ত হয়ে, কবি যখন আলো নিভিয়ে দিলেন, অমনই "উচ্ছ্বসিত স্রোতে / মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চর্তুদিকে হতে / চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি/ ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।" স্পষ্টতই কবি এখানে অনুভব করলেন সৌন্দর্য আস্বাদন প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে, সহজ আনন্দের মধ্যেই সম্ভব।

নিসর্গ প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আস্বাদনের স্পৃহা উপযুক্ত দুটি কবিতায় আছে। তবে সৌন্দর্য উপলব্ধির চরম উৎকর্ষতা লক্ষ করা যায় 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'আবেদন' প্রভৃতি কবিতায়। 'উর্বশী' কবিতা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুরাগ আদর্শ কল্পনারঞ্জিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই মন্ময়তামুক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে এক সার্বভৌম রূপচেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে।"(রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা') উর্বশীর সৌন্দর্য কল্পনায় কবি পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন ঠিকই, কিন্তু উর্বশীর রূপও তার অপার্থিব অস্তিত্বের ধারনার ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য কালিদাসের উর্বশী স্বর্গ নারী এবং কল্যাণবোধ ও নীতিআদর্শের থেকে বিচ্ছিন্ন, পরিশেষে কিছুটা মানব সম্পর্কে গৃহ রমণী হয়ে উঠতে দেখি উর্বশীকে। তবে উর্বশীর রূপবর্ণনায় কালিদাস তাকে প্রায় অপার্থিব সৌন্দর্য সত্ত্বায় পরিনত করেছন। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী তো বটেই, পার্থিব কোনো বন্ধনের মধ্যেও তাকে ধরা যায় না— "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী/ হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী অপার্থিব অস্তিত্ব বলেই ‘উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা।’ তার সৃষ্টিরও কোনো ইতিহাস নেই।তাই ‘ বৃন্তহীন পুস্পসম আপনাতে আপনি বিকশি / কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।” সে ইন্দ্রের সুর সভাস্থলে নৃত্যের তালে প্রলুব্ধ করে পুরুষচিত্তকে তার।কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবনের যৌবনচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, মুনিদের ধ্যান ভঙ্গ হয়।তবু সে ধরা দেয়না।

বস্তুত, অপার্থিব সৌন্দর্য, অপার্থিব অস্তিতের এই নারীকে পার্থিব শরীরী রূপে ও সম্পর্কে ধরা যায় বলেই সে ইন্দ্রিয়জ কামনার অতীত, সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তার সৌন্দর্যকে অনুভবে স্পর্শ করা যায় মাত্র, লাভ করা যায় না। তাই এই সৌন্দর্য বর্তমানে অধরা স্মৃতি হয়ে আছে। তাই ‘ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছাসে / কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে। এই বিষন্নতা সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার বিরহের ‘ব্যাকুল করা বাঁশি’-র মতোই তা অশ্রুরাশি হয়ে ঝরে পড়ে। আর আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে।’

‘উর্বশী’ কবিতায় উর্বশী তাই অপার্থিব সৌন্দর্যের একটি আইডিয়া হয়েই থেকে গেছে। কবিতাটিতে দেহজ-কামনা বর্জিত যে চিরন্তন সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা আমরা দেখলাম, সেই ব্যাকুলতারই আর একটি রূপ ফুটে উঠেছে ‘বিজয়িনী’ ও ‘আবেদন’ কবিতায়। সরসীনীরে স্নানরতা রমণীর তিলোত্তমা সৌন্দর্যরূপকে পার্থিব রমণীর শরীরী রূপ বলে মনে হয় না। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বলেই অনঙ্গদেবের পূষ্পশর সেই নারীর পদপ্রান্তে পূজা উপচার হয়ে যায়। পরাভূত হয়ে অনঙ্গ নতশির হয়ে বসেন—

“... ভূমি’ পরে

জানুপাতি বসি নির্বাক্ বিস্ময়ভরে

নতশিরে পুষ্পধনু পুস্পশরভার

সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার

তূণ শূন্য করি..”।

'আবেদন' কবিতায় ঠিক একইভাবে রানির সৌন্দর্যের অনুরাগী ভৃত্যাটি রানির কাছে আবেদন রেখেছে - নিকুঞ্জের অনুচর । আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'। প্রভুর কাছে ভৃত্যের এই বাসনাও আসলে প্রয়োজন-সম্পর্ক রহিত চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতি কবির গভীর অনুরাগকেই প্রকাশ করেছে।

'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ একটি স্থির ও বিশিষ্ট আদর্শের রূপ হয়ে। কবিতাগুলিকে অপূর্ব করে তুলেছে। সৌন্দর্যবোধের যে আদর্শ তিনি নির্মাণ করেছেন, তা কোনো বিশেষ তত্ত্বের অনুসারী নয়। কবিকল্পনার গভীরতা, সত্য ও সুন্দরের একাত্মবোধ মিলেই গড়ে উঠেছে কবির সৌন্দর্যবোধের আদর্শ যা একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক.

৯.৭ কাহিনি-প্রধান কবিতা

চিত্রার কাহিনি-মূলক বা গল্পপ্রধান তিনটি কবিতাই অত্যন্ত সুন্দর ও সুখপাঠ্য। এই কবিতা তিনটি হল 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'। সুকুমার সেন এই তিনটি কবিতার মধ্যে 'অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবনের মহৎ মূল্য' খুঁজে পেয়েছেন। এই কবিতাগুলি 'চিত্রা'র চেনা ছকের থেকে একটু পৃথক। যে উত্তুঙ্গ কল্পনাবিলাস, সৌন্দর্যভাবনার যে গভীরতার জন্য চিত্রা'র কবিতাগুলি পরিচিত, সেই কল্পনা-বিলাস কিংবা সৌন্দর্যভাবনার গভীরতা আলাোচ্য কবিতাগুলিতে নেই। এই কবিতাগুলির উদ্ভবের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। মানব জীবনের ধারায় অবহেলিত, অবজ্ঞাত, তুচ্ছ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসাধারণত্ব লুকিয়ে থাকে, তাকে যেন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে কবির কল্পনা নেমে বসেছে সংসারের গণ্ডিতে। চির পরিচিত বৈশিষ্ট্যহীন অতিসাধারণের মনাোজগতের মণিমুক্তাগুলিকে চয়ন করতে চেয়েছেন।

অবশ্য কবিতা তিনটির মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটির প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। এখানে কবি ভারতবর্ষের পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে ফিরে গেছেন। কবিকল্পনা এখানে অতীত-সঞ্চারী হয়ে সেই অতীতের মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছে। চিত্রা'-পরবর্তী যুগে কথা' কাহিনী'র মধ্যে অতীত ভারতের গৌরব আবিষ্কারের যে চেষ্টা এর পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে

আছে, তারই পূর্ব ইঙ্গিত যেন ‘ব্রাহ্মণ’ কবিতাটি। অবশ্য পৌরাণিক আখ্যানকে আশ্রয় করে অতীতের কাহিনির নব-মূল্যায়নের এই প্রয়াস ‘চিত্রা’র আগেও দেখা গেছে। মানসী’-র ‘অহল্যার প্রতি’এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। তারও পরে কবি ‘চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯ব., ভাদ্র) লিখেছেন, লিখেছেন ‘বিদায় অভিশাপ’ (২৬ শ্রাবণ, ১৩০০ব.)। সেই ধারারই কবিতা ‘ব্রাহ্মণ’ (৭ ফাল্গুন, ১৩০১ব.)।

‘ব্রাহ্মণ’ কবিতার কাহিনি ‘ছান্দোগ্যোপনিষদ’-এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে নেওয়া। গোত্র-পরিচয় হীন জবালা-পুত্র সত্যকামের সুমহান চরিত্র মহিমাকে এই কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরাণের কাহিনির কঙ্কালে কবি কল্পনার - রক্তমাংস সঞ্চার করেছেন। অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে’ যখন সন্ধ্যা সূর্য অস্ত গেছে, ঋষি গৌতমের তপোবন আশ্রমে ঋষিপুত্রগণ গুরু গৌতমকে ঘিরে বসে আছেন। গৌতম তাঁদেরকে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলবেন। এই যখন পরিবেশ -

“হেনকালে অর্ঘ্য বহি

করপুট ভরি পশিলা প্রাঙ্গণ তলে।

তরুণ বালক”

ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা অভিলাষী, তরুণ বালক সত্যকামকে মহর্ষি গৌতম গোত্র পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন,

কেননা ‘শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যালাভে।’ ব্যর্থকাম সত্যকাম ফিরে মায়ের কাছে জানতে চাইলেন তার গোত্র পরিচয়— ‘ কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম/ কী বংশে জনম। ... কী ।।গোত্র আমার?’ মাতা জবালা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে বলেন

“জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে -

গোত্র তব নাহি জানি তাত।”

সত্যকাম পরদিন মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে গিয়ে মায়ের উত্তর ব্যক্ত করলেন নির্ভীক কণ্ঠে। এই নিষ্ঠুর সত্য কথা হতে পারত ব্যর্থ অভিলাষের কারণ। এই সত্য হতে

পারত তার অপমানের কারণ, যে অপমানের ছবিও মুহূর্তে ফুটে উঠেছিল গৌতমশিষ্য ব্রাহ্মণছাত্রগণের কথায়, - "কেহ করিল ধিক্কার/ লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।" শুধু হাসেননি গৌতম, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌতম, ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম। আসন ছেড়ে উঠে তিনি বালক সত্যকামকে আলিঙ্গন করে বললেন- "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত - / তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!"

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তার ঔদার্যে। ব্রাহ্মণের গোত্রে জন্ম হলেও ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, তা অর্জন করে নিতে হয়। গৌতমের মহৎ ঔদার্যে এবং বালক সত্যকামের নির্ভীক সত্যনিষ্ঠার স্বীকৃতিতে সেই মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

মহৎ হৃদয়ের মূল্য কবির কলমে একটু ভিন্নভাবে, ভিন্ন-উৎসে ফুটে উঠেছে 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতাদুটিতেও। এই দুটি কবিতার কাহিনি মানব-সংসারের অতি সাধারণ ঘটনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুকুমার সেন এই কবিতাদুটি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিতার ভূমিতে গল্পগুচ্ছের প্রবেশক বলে বর্ণনা করেছেন। ১৮৯১ থেকে কবি 'হিতবাদী', সাধনা', 'ভারতী' পত্রিকায় সমান্তরালভাবে ছোটগল্পও লিখে চলেছেন। পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখের আলোছায়া ও প্রকৃতির কোলে লালিত সাধারণ মানুষের কথাই সে গল্পগুলিতে উঠে এসেছিল। যা তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন ছোটোগল্পোর পাতায়, তাকে কবিতার রাজ্যেও নিয়ে এলেন। তবে 'চিত্রা'র আলোচ্য কবিতাদুটিই এর প্রথম পদক্ষেপ নয়, এর আগে 'সোনার তরী'র 'গানভঙ্গ' কবিতায় বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ রায়ের বৃদ্ধ বরলালের তাল ভোলা গানের মর্ম-সঙ্গী হয়ে ওঠার কাহিনিতে কিংবা 'পুরস্কার' গল্পে অভাবগ্রস্ত, কবির গান শুনে মুগ্ধ রাজার কাছে তার পুরস্কার প্রার্থনা (কণ্ঠ হইতে দেহে মোর গলে / ওই ফুলমালাখানি।') করার মধ্যে সেই অবজ্ঞাত মানুষেরই মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'চিত্রা'র কবিতাদুটি আরও বেশি হৃদয়সংবেদী হয়ে উঠেছে মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শতার কারণে।

'পুরাতন ভৃত্য'-র পরিচিত চাকর কৃষ্ণকান্ত ওরফে কেষ্টা, কাজের লোক হিসেবে পটু তো নয়ই বরং তার অপটুতা অকৃতকার্যতার হিসেবটাই কবিতায় বেশি করে আছে। অবহেলিত অবজ্ঞাত এই মানুষটি কাজের সংসারে কোনো কাজে লাগে না, বরং কাজ

নষ্ট করে সে। তাকে রাখা মানে - "শুধ টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো"। রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'বাজে কথা' প্রবন্ধে সংসারে বাজে কথার মধ্যেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায় বলেছিলেন। 'চিত্রা'-র 'আবেদন' কবিতাতে ভৃত্যটি 'ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিংকর / কী কাজে লাগিবি?' রানির এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল- 'অকাজের কাজ যত, / আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।' ঠিক এই অকাজের কাজ করার মানুষই কেষ্টা। তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও এড়িয়ে যাওয়া যায়না।

এই চির অবত অবহেলিত মানুষটিই বৃন্দাবনের অপরিচিত স্থানে কবির নিঃসঙ্গ বিপদের দিনে একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠল। বসন্তে যখন মনিব মরণাপন্ন, তার ইয়ার বকশি'রা যথারীতি পলাতক, দেবতা বা মালিও সেই মুহূর্তে সঙ্গে নেই। অকাজের কাজ, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো ভৃত্য কেষ্টাই অবিরাম সেবায় তাকে বাঁচিয়ে তোলে, নিজের প্রাণ বিপন্ন করে।

"লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে;

নিল সে আমার কালব্যাধির আপনার দেহ পরে।"

প্রাণের নিভৃত দেবতার কাছে অঞ্জলি নিবেদন করার মতোই পুরাতন ভৃত্যটির পায়ে কবি যেন নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

দুই বিঘা জমি কবিতা হিসেবে অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের। দরিদ্র প্রজা উপেনের হৃদয়ের পরিচয়ের চেয়েও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল কবিতাটির বিষয়গভীরতা। ভূস্বামী জমিদারের শোষণের নগ্ন রূপ ও অত্যাচারের কথা কবিতাটিতে যেরকম ফুটে উঠেছে তা রবীন্দ্রকবিতায় অভূতপূর্বই বলা যায়। অন্যদিকে সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া'— সেই মাটির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতাবোধে আপ্লুত প্রজা উপেনের কথাও রবীন্দ্র কবিতায় এর আগে আসেনি। অবশ্য এই শোষিত বঞ্চিত মানুষটিকেই কবি মহৎ করে তুলেছেন পার্থিব সম্পদের প্রতি তার নিষ্কাম দৃষ্টিতে।

কিন্তু তবু কি উপেন ভুলতে পেরেছে তার সেই প্রাণাধিক দুই বিঘা জমিটিকে? সে তা পারেনি "ভূধর সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি

নে সেই বিঘা-দুই জমি।" উপেনের এই স্বীকারোক্তি এবং না অধিকারে মাটির কাছে ফিরে আসা, কবিতাটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। নাটকীয়ভাবে দুটি পাকা ফল কুড়োনো নিয়ে বাবুর কাছে অপমানিত হওয়া এবং 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়' সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে কবিতাটি চরম পরিণামে পৌঁছেছে। উপেনের নীরব প্রতিবাদহীন মহৎ হৃদয়ের প্রতি কবি তাঁর জয়মালা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কবিতাটিতে অত্যাচারী লোভী জমিদারের প্রতি কবির ঈষৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত ভৎর্সনাও অপরিস্ফুট থাকেনি- 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'

৯.৮ সারাংশ

'চিত্রা'র বিষয় ও ভাবগত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কবিতাগ্রন্থটি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে এই কটি কথা বলা যায়-

'চিত্রা' রবীন্দ্র-কবি-মানসের যে বিশিষ্ট ভাবনার জন্য পরিচিত সেটি জীবনদেবতা ভাবনা। জীবন বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা', 'চিত্রা' এবং 'সিন্ধুপারে'। কবির ব্যক্তিজীবনে সৃষ্টিকর্মের এবং সুখদুঃখময় বাস্তব জীবনের চালিকা শক্তি এই জীবনদেবতাই ক্রমে ব্যক্তিজীবন থেকে বিশ্বজীবনের অসীমতায় এবং ক্রমে তা থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনু-পরমাণুর বোধে এমনকি জন্মজন্মান্তরের চেতনায় পৌঁছেছে। বলা চলে কবির ব্যক্তি-অস্তিত্ব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ রূপে সেই বিশ্ব-অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক – এ দুয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনই হল জীবনদেবতা। সিন্ধুপারে' রপকথার রহস্যময় জগৎ হলেও এখানে জীবনদেবতার সঙ্গে কবির মৃত্যুর পরপারে নবজীবনের সম্পর্কের পরিপূর্ণতা ঘটেছে।

'চিত্রা'-য় শুধু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাবিলাসী রোমান্টিকতাই আছে তাই নয়, কবি এখানে কল্পনার জগত থেকে নেমে এসেছেন ধুলোমাটির বাস্তব পথিবীতে।'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি বাস্তবের কণ্টকিত জীবনের পথ বেয়ে এক আদর্শবোধের জগতে পৌঁছেছেন।

'উর্বশী' রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। কবির সৌন্দর্যবোধ এখানে পুরাণের উর্বশী চরিত্রের অপার্থিব সৌন্দর্য, অপার্থিব অস্তিতের চিরন্তনতা এবং তার জন্য মানুষের বিরহব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। এই পূর্ণতর সৌন্দর্য বধেরই প্রতিমূর্তি 'বিজয়িনী' কবিতার- 'বিজয়িনী। রবীন্দ্রনাথের বোধে যে কামগন্ধহীন আদর্শ সৌন্দর্যের স্থান আছে বিজয়িনীর পদপ্রান্তে মদনদেবের পুষ্পশরের নত হওয়া এবং আবেদন' কবিতায় রানির চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ বশত ভৃত্যের মালাকর হতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনি-প্রধান কবিতা তিনটি। তিনটি কবিতাই সাধারণ অবহেলিত অবজ্ঞাত মানুষের মহৎ হৃদ-কথা। এর মধ্যে 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' মানব জীবনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে লেখা। শেষ কবিতাটিতে কবি উপেনের মহৎ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা জানালেও অত্যাচারী লোভী জমিদারের শোষণ অত্যাচারের নগ্ন রূপটিকে তুলে ধরে ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত ভৎর্সনাও করেছেন।

৯.৯ অনুশীলনী

১। চিত্রা' কবিতাসংকলনের অন্যতম উপলব্ধি হল রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাভাবনা। – প্রাসঙ্গিক কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

২। অলৌকিক কল্পনা 'চিত্রা'-র কবিতাগুলিতে এক রহস্যময় রোমান্টিকতার সঞ্চার করেছে – আলোচনা করুন।

৩।'চিত্রা'-র কবিতায় মর্ত্যভাবনা কবিকল্পনার দূরাভিসার সত্ত্বেও সুপরিস্ফুট হয়েছে – আলোচনা করুন।

৪। চিত্রা' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার স্বরূপ আলোচনা করুন।

৫।প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে চিত্রা' কবিতাগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। 'চিত্রা'য় মতপ্রতিমূলক কবিতাগুলি আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্য-চেতনার কোন বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটে উঠেছে আলোচনা করুন।

৭। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার মিশ্রণে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত 'উর্বশী' কবিতাতেই কবির সৌন্দর্য বাসনার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে। সমালোচকের এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য - বিচার করুন।

৮। 'যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করে প্রিয়কে পাবার আকাঙক্ষা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। - কবির এই মন্তব্য কতদূর যথার্থ হয়েছে তা কবিতাটির মর্মার্থ উদ্ধার করে দেখান।

৯। 'চিত্রা' কবিতাগ্রন্থের শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' কেবল রূপকের স্ফটিক পাত্রে রূপকথার উজ্জ্বল রসের রোমান্টিক রসপরিণতি নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাতত্ত্বের পূর্ণবলয়টিও সেখানে উন্মোচিত হয়েছে। – আলোচনা করুন।

১০। চিত্রা'র কাহিনি-প্রধান কবিতাগুলিতে অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবনের মহৎ মূল্য রেখাচিত্রিত হয়েছে— প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে এই মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

১১। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির পাঠান্তরের রূপটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাতে কেরানি- জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, – কবিতাটির প্রচলিত রূপটির সঙ্গে পাঠান্তরের তুলনা করে, কোন রূপটি বেশি গ্রহণযোগ্য তা যুক্তি দিয়ে আলোচনা করুন।

১২। 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি 'সাধনা' পত্রিকায় 'শান্তি' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে কবিতাটির নাম পরিবর্তনের যুক্তি কতখানি ছিল, তা পাঠান্তর বিশ্লেষণ সূত্রে তুলে ধরুন।

৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - রবীন্দ্রসৃষ্টি - সমীক্ষা

২। ক্ষুদিরাম দাস - রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়

৩। নীহাররঞ্জন রায় - রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

৪। প্রমথনাথ বিশী - রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ

৫। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য - 'রবিরশ্মি'

৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী - রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা

একক ১০ চিত্রার কাব্যসৌন্দর্য

বিন্যাসক্রম

১০.১ আঙ্গিক ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ

১০.২ পাঠান্তরে প্রেমের অভিষেক ও মৃত্যুর পরে

১০.৩ চিত্রার আঙ্গিক বিশ্লেষণ

১০.৪ ছন্দ বৈচিত্র

১০.৫ অলংকার ও চিত্রকল্প

১০.৬ রবীন্দ্র কাব্যে চিত্রার স্থান

১০.৭ অনুশীলনী

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ পাঠান্তর, আঙ্গিক ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ

কবিতা লেখা ব্যাপারটা একজন মানুষের কাছে কতটা অনুভূতি বা কল্পনার আর কতটাই বা তার নির্মাণ ক্ষমতার সে নিয়ে তাত্ত্বিক প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। স্বভাবকবি বলে একটা কথা আছে। শুধু অনুভূতি আর কল্পনার তীব্রতায় কেউ কেউ নির্মাণ শিল্পকে বিশেষ পাত্তা না দিয়েই কবিতা লিখতে পারেন। সে কবিতাও হতে পারে সার্থক। জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’-র অনেক কবিতাই রূপকল্পে অত্যন্ত কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও শুধু কবির অনুভূতির তীব্রতায় কবিতা হিসেবে সার্থক হয়ে আছে। ছবি আঁকার ব্যাকরণ না জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ছবি শিল্প হিসেবে সার্থক হয়েছে শুধু কল্পনাশক্তির তীব্রতায়। কিন্তু এগুলি দু একটি ব্যতিক্রম হতে পারে, নির্মাণহীন শিল্প

বলে কিছু হয় না। যে কবি ছন্দ-অলংকার জানেন না, জানেন না চিত্রকল্প কী, তাঁর কবিতাতেও কিছু নিমাণকৌশল দেখা যায়। পরিচিত মুখের গদ্য ভাষাকেই শুধুমাত্র শব্দ সাজানো কৌশলে কীভাবে কবিতা করে তোলা যায়, তা অনেক কবির রচনাতেই দেখতে পাই। বস্তুত, নমাণশিল্প কবিতার সার্থকতার একটি অন্যতম মাপকাঠি। কবির অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গে এই শিল্প-নির্মাণের কারুকার্য মিলেমিশেই কবিতা হয়ে ওঠে সার্থক। সেদিক থেকে কবিতার ভাষা-নির্মাণ, শব্দ চয়ন, শব্দ সাজানোর কৌশল, পংক্তি সজ্জা বা স্তবক নির্মাণ এবং তারই সঙ্গে ছন্দ, অলংকার ও চিত্রকল্প এমনকি সাংগীতিক মূর্ধনা - প্রভৃতি মিলেমিশে একটি সার্বজনিক ঐক্য গড়ে ওঠে। তাকেই আমরা বলি কাব্য সৌন্দর্য। পাঠান্তরের মধ্যে শুধু যে কবিতার অন্যতর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকতে পারে তাই-ই নয়, এমনও হতে পারে সে পাঠ পরিবর্তিত করা হয়েছে শুধু নিমার্ণশিল্পের কথা ভেবে। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি প্রথমে ছয় মাত্রার দুটি পর্বের পংক্তি দিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন কবি, পরে তা বর্জন করে বর্তমান কুড়ি মাত্রার পঙক্তিতে লেখা হয়েছে। তবে প্রধান বিষয় চিত্রার কাব্যসৌন্দর্য বিষয়ক আলোচনার বিয়েটিকে দুটো উপরে ভাগ করা হয়, - ছন্দ-বিষয়ক অন্যটি অলংকার ও চিত্রকল্প বিষয়ক।

১০.২ পাঠ ও পাঠান্তরঃ 'প্রেমের অভিষেক', 'মৃত্যুর পরে'

'চিত্রা'র অন্ততপক্ষে চার কতির কিছু পাঠান্তর, পাণ্ডুলিপিতে অথবা 'সাধনা' পত্রিকার মধ্যে উপস্থিত। এই চারটি কবিতার মধ্যে 'প্রেমের অভিষেক' এবং 'অন্তর্যামী' কবিতাদুটির বিস্তৃত পাঠ বর্জিত হয়েছিল। সেই বর্জিত পাঠ বিশ্লেষণ করলে করি ভিন্নতর অর্থ-তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

প্রেমের অভিষেক সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি কবিতাটি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে, কোনো কোনো পাঠকের বিশেষত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের প্রবল আপত্তিতে বন্দ্রনাথ কবর বিস্তৃত পাঠ বর্জন করে, কিছু অদলবদল ঘটিয়ে তা 'চিত্রা' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। আর বর্জিত ও পরিবর্তিত পাঠের সঙ্গে বর্তমান কবিতাকে মিলিয়ে দেখব, কী পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতাটির প্রচলিত যে পাঠ আমরা দেখি সেখানে কবিতাটি মোট তিনটি স্তবকে যে উনষাট ছত্রে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা

অনুযায়ী প্রচলিত এই পাঠটিই নাকি কবিতাটির অদি রূপ। পরে 'সাধনা'-য় প্রকাশিত পাঠটিই কবিতাটির পরিবর্তিত রূপ। যাই হোক, এই উনষাট ছত্রের মধ্যে প্রথম সক উনিশ ছত্রে, দ্বিতীয়টি চোদ্দো ছত্রে এবং তৃতীয় স্তকটি বাকি ছাব্বিশ ছত্রে রচিত।

প্রচলিত পাঠে কবিতাটিতে কোথাও বস্তু নিজেকে 'কর্মচারী' বলেননি। 'হেথা আমি হে নহি,/ সহস্রের মাঝে একজন- সদা বহি সংসারের ক্ষুদ্র ভার' - প্রচলিত এই পাঠ কিন্তু সাধনাতেও ছিল। অর্থাৎ দুটি পাঠের মূলতম প্রভেদ ওই কেরানি বা কর্মচারীর জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা অকুণ্ঠিত হবিই তুমুল বিচারে কোন্ পাঠটি বেশি গ্রহণযোগ্য সেকথা বলার আগে প্রথমে সাধনার পাঠটিকে এক বিশ্লেষণ করা যাক।

সাধনায় কবিতাটি শুরু হয়েছিল কবি কর্মচারীর একটু অভিমানী কণ্ঠে –

"কী হবে শুনিয়া, সখি, বাহিরের কথা,

অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা

যত কিছু! লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,

কোথা আমি বুঝে মরি এক পার্শ্বে তার

এককণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি

আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি

জনস্রোত হতে। ..."

ধারাবাহিকভাবে এই পাঠ এগিয়েছে বিস্তৃততর হয়ে। কিন্তু উপযুক্ত ছত্রকটির পরেই ছিল "সেথা আমি কেহ নহি, / সহস্রের মাঝে একজন, .." ইত্যাদি পাঠ, যা প্রচলিত পাঠে কবিতাটির শেষ স্তবকে সজ্জিত আছে। প্রচলিত পাঠে শুধু এই অংশটুকুতেই কবি নিজেকে সংসারের ক্ষুদ্র তুচ্ছ একজন অতি সাধারণ, সহস্রের মাঝে একজন' বলেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকের ঠিক তেরোতম ছত্রের ("অঙ্গ মোর হয়েছে অমর?...") শেষে আবার কিছুটা অংশ যুক্ত হয়েছিল 'সাধনা'র পাঠে। সাধনা'র পাঠের সেই অংশটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানেই আছে কেরানি জীবনের বাস্তবতার ছবি

" ক্ষুদ্র আমি

কর্মচারী, বিদেশি ইংরাজ মোর স্বামী

কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে

সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,

মোর দুঃখ নাহি মানে; ...

...এত বলি হাস্যমুখে

ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ জ্বালা

আনন্দমন্দির মাঝে, নিভৃত নিরালা

শান্তিময়! - প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি

আমি যেথা রাজা! আমার নন্দন ভূমি

একান্ত আমার। ..."

কবির কেরানি জীবনের এই ছবি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'পুনশ্চ' কবিতাগ্রন্থের হরিপদ কেরানির কথা (কবিতা বাঁশী')। রেলের কর্মচারী হরিপদ কেরানির অফিসের ব্যস্ততা অথবা তার বাসার নংরা, বীভৎস গলির ছবি এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই তুলনীয় হতে পারতো। কিন্তু ওই পর্যন্তই মিল। বাসা বা গৃহে ফেরার পরে দুটি চরিত্রের প্রেমের অনুভূতি ও তার ব্যঞ্জনা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। হরিপদ কেরানির মনে ভেসে আসে যে নারীর ছবি, সে সাংসারিক সম্পর্কে সম্পর্কিত- পিসির 'দেওরের মেয়ে', 'অভাগার' সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিক ঠাক। হরিপদর প্রেম হয়তো একান্তভাবেই তার নিজের মনের দিক থেকে। আর সেই প্রেম মোটেও আদর্শ কল্পনা নয় বরং কিছুটা কামনারঞ্জিত। অন্যদিকে 'প্রেমের অভিষেক'-এর কবি করানির প্রেম আইডিয়াল। তার মনের মধ্যে আছে যে নারী সে যেন মানসসুন্দরীর এক বিমূর্ত-কল্পনা। তাই তার প্রেমও কামনাশূন্য বিশুদ্ধ।

দুটি পাঠ ও পাঠান্তরের বিশ্লেষণে উপযুক্ত কবিতাদুটির তুলনার প্রয়োজন এই কারণেই ছিল যে, তুলনাটি বিশেষভাবেই 'সাধনা'-র পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রচলিত গ্রন্থে কোথাও স্পষ্ট করে কর্মচারী। জীবনের বাস্তব কর্মব্যস্ততার ছবি নেই বলেই হরিপদ কেরানির সঙ্গে তার অমিলটাই বেশি হয়ে উঠেছে।

'সাধনা'তে কবিতাটির এর পরবর্তী পাঠের সঙ্গে প্রচলিত পাঠের মিল আছে। আর সে মিল প্রচলিত কবিতাটির শেষ চোদ্দোটি ছত্রের সঙ্গে। গৃহে ফেরার পর যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী মানসসুন্দরীর সঙ্গ সে লাভ করে, সর্ব দেহ মন চরিতার্থ হয় প্রেমের অভিষেকে, সেই কথাই সাধনায় মুদ্রিত কবিতাটিতে পরবর্তী সতেরোটি ছত্রে বলা হয়েছে। 'চিত্রা'-য় কবিতাটি এখানেই শেষ হয়েছে। 'সাধনা'য় কবিতাটি এখানে সবে মাত্র দ্বিতীয় স্তবকে দশটি মাত্র ছত্রে গিয়ে পৌছেছে। তারও পরে স্তবকটিতে আঠাশ ছত্র আছে, যেখানে আবার এসেছে সেই অফিসের কথা, সাহেবটির কথা—

"... বড়ো পেয়েছিনু ব্যথা

আজি, বড়ো বেজেছিল অপমান, যবে

অপোগণ্ড সাহেবশাবক রূঢ় রবে

করিল লাঞ্ছনা। হায় এ কী প্রহসন

এ সংসার! .."।

... সংসার এমনি ধারা অদ্ভুত-আকার—

কে যে কোথা পড়িয়াছে স্থির নাহি তার,

অস্থানে অকালে! আর্তনাদে অট্টহাস্যে

চলেছে উৎকট যন্ত্র অন্ধ ঊর্ধ্বশ্বাসে

দয়ামায়াশোভাহীন; .. "

এই বাস্তব বীভৎসতার কথা বলে, তার বিপরীতে কবি তাঁর ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণের কথা বলেছেন, যেখানে আছে কল্যাণকামনা, আছে মানসসুন্দরীর 'স্মিতহাস্যসুধাস্নিগ্ধ', যেখানে "আমি ক্ষুদ্র নহি কভু ! যত দৈন্য থাক মোর, দীন নহি তবু।"

গুরুত্বপূর্ণ কথা হল সাধনা'-য় মুদ্রিত উপযুক্ত দুটি স্তবকের মোট তিরিশটি ছত্র প্রচলিত পাঠে কবিতাটি যেখান থেকে শুরু হয়েছে, তার আগে মুদ্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রচলিত কবিতাটি 'সাধনা'-র শেষ অংশে ছিল, তবে অবশ্যই অংশটিকে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিবর্তন করেছিলেন। বিশেষ করে 'চিত্রা'-য় প্রকাশিত কবিতাটির শেষ স্তবকের অনেকটা অংশই 'সাধনা'র মুদ্রিত পাঠে পরিবর্তিত আকারে ছিল।

* প্রচলিত পাঠের প্রথম স্তবকের শেষ যেখানে, সাধনার পাঠে সেখানে আরও নয়টি ছত্র ছিল। সেখানেও ছিল কর্মক্ষেত্রের কথা—

'আধুনিক রাজধানী,

আমি তারি আধুনিক ছেলে,ঘরে আনি

চাকুরির কড়ি; ফিরে আমি দিন শেষে

কর্ম হতে, ... "

শেষে ছিল এই বাস্তবতার জগত থেকে প্রেয়সীর প্রেমমন্ত্র বলে এক অন্য লোকে পৌঁছে যাওয়ার কথা—

"তব প্রেম মন্ত্রবলে।

ইতর জনতা হতে কোথা যাই চলে

নব দেহ ধরি! ... "

এই ছত্রগুলির পর ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত পাঠের দ্বিতীয় স্তবকটিও ছিল। তবে প্রচলিত পাঠের তৃতীয় স্তবকটির পরিবর্তে ছিল দশ ছত্রের অন্য একটি স্তবক

" হেরো, সখি, গৃহছাদে

জ্যোৎসার বিকাশ! ...

... এ কৌমুদী

আমাদের দুজনের! দুটি আঁখি মুদি

বারেক শ্রবণ করো - সুগম্ভীর গান

ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে, দুটি প্রাণ

বাঁধিছে একটি সুরে! স্তব্ধ রাজধানী

দাঁড়াইয়া নতশিরে মুখে নাহি বাণী!"

মুদ্রিত দুটি পাঠের তুলনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দিকটি হল, সাধনা'র পাঠে কেরানি জীবন তথা কর্মক্ষেত্রের রূঢ় বাস্তবতার কথা যে অংশগুলিতে ছিল, 'চিত্রা'র প্রকাশিত পাঠে সেই সমস্ত অংশগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। এই বর্জনের ফলে কবিতাটির পাঠ আস্বাদনই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 'সাধনা'র রূপটিতে একদিকে বাস্তব জীবনের ছবি অন্যদিকে প্রেমের অমৃতলাোকের মহিমাময় রূপ, এই দুটি স্তর পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হতে পারেনি। এই কারণেই লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মতো কেউ কেউ কবিতাটি সম্পর্কে আপত্তি করেছিলেন। ফলে তাদের কথা ধরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "কোনো আপিস কেরানি বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস- সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা এর বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখানো হয়-..." স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল 'চিত্রা' য় প্রকাশিত পাঠের প্রতিই। এই কারণেই সাধনার পাঠকে অনেক কাট-ছাঁট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 'চিত্রা' য় প্রচলিত পাঠে রূপ দেন। এই পরিবর্তনে কবিতাটি অনেক বেশি সংহত হয়ে উঠেছে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, আদর্শ প্রেমের ঐশ্বর্যময় রূপটির ব্যঞ্জনাই সমগ্র কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

'মত্যর পরে' কবিতাটি সাধনাতে মুদ্রিত হয়েছিল 'শান্তি' নামে। আর কবিতাটিতে সেখানে ছিল বর্তমান কবিতার একুশটি স্তবকের মধ্যে মাত্র সাতটি স্তবক। অথাৎ চোদ্দোটি স্তবক কবি নতুন সংযোন করেছিলেন 'চিত্রা' গ্রন্থ প্রকাশের সময়। অনুমান

করা সহজ যে কবিতাটি কতখানি পরিবর্তন করা হয়েছে। নাম ছিল ‘শান্তি’, তা হল ‘মৃত্যুর পরে’। পুরোনো স্তবকগুলি অপরিবর্তিত রেখেছেন অথচ স্তবক-সজ্জায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ‘শান্তি’ নামাঙ্কিত কবিতার সাতটি স্তবক বর্তমান কবিতার এক, দুই, চার, ছয়, সাত, কুড়ি ও একুশতম স্তবক হিসেবে সজ্জিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম সাতের মধ্যে তৃতীয়, পঞ্চম এবং অষ্টম থেকে উনিশ এই স্তবকগুলি পরে সংযোজিত। আমরা প্রথমে দেখবো 'সাধনা'-য় মুদ্রিত অবস্থায় কবিতাটির ভাববৈশিষ্ট্য কী ছিল?

প্রথম স্তবকের শুরুতেই কবি পরোক্ষ কারও মৃত্যুর কথা বলেছেন- ‘আজিকে হয়েছে শান্তি, / জীবনের ভুলভ্রান্তি/ সব গেছে চুকে। মৃত্যুর সঙ্গেই চুকে গেছে তার সুখ, দুঃখ, রোগ-জ্বালা, ভালো-মন্দের দ্বিধা দ্বন্দ্ব-সব কিছুই। তাই - ‘বলো শান্তি, বলো শান্তি,’ দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলেছেন, সেই মৃত ব্যক্তির জীবন স্বপ্নের লেশ যদি কারও মনে থেকে থাকে তাও যেন মরে যায়। এখন স্মৃতি নয়, তার শিয়রের কাছে বসে ‘গুঞ্জরি করুণ তান ।/ ধীরে ধীরে করো গান’। চতুর্থ স্তবকে কবিতাটিতে একটু মৃত ব্যক্তির পরিচিত মানুষদের কথা বলেছেন। মৃত্যুর পরে যারা ব্যক্তিটির মরদেহে ফুলের স্তবক দিতে এসেছে এবং শোক প্রকাশ করছে, তাদের এই সহমর্মিতা অর্থহীন। এমনকি যারা তার শত্রু ছিল, এখন যদি তারা তাকে মার্জনাও করে, তবে তাও বৃথা। কেননা- ‘অসীম নিস্তব্ধ দেশে / চির রাত্রি পেয়েছে সে /অনন্ত সান্ত্বনা।’

ষষ্ঠ স্তবকে কবির সান্ত্বনাবাণী একটু দার্শনিক বাোধের ছোঁয়া পেয়েছে। মৃত সেই ব্যক্তিটিকে এখন যে যাই খুশি বলুক না কেন, সে সকল সমালেচানার ঊর্ধ্বে ‘অনন্ত জনম-মাঝে /গেছে সে অনন্ত কাজে,। তাই কবির সান্ত্বনা

“আর পরিচিত মুখে / তোমাদের দুঃখে সুখে / আসিবে না ফিরে।

তবে তার কথা থাক / যে গেছে সে চলে যাক / বিস্মৃতির তীরে।।”

সপ্তম স্তবকে

“জানি না কিসের তরে / যে যাহার কাজ করে / সংসারে আসিয়া,

ভালোমন্দ শেষ করি / যায় জীর্ণ জন্মতরী / কোথায় ভাসিয়া!"

কবিতার ষষ্ঠ অথাৎ বর্তমান কবিতার কুড়িতম স্তবকটিতে মৃত্যুর বোধ সাংসারিক জগত ছাড়িয়ে

অসীমতায় প্রসারিত

"ওই হেরো সীমাহারা / গগনেতে গ্রহতারা/ অসংখ্য জগৎ,

ওরই মাঝে পরিভ্রান্ত/ হয়তো সে একা পান্থ / খুঁজিতেছে পথ।"

শেষ স্তবকে আবার ফিরে এসেছে সেই সাংসারিক তথা পার্থিব জগতের সমস্ত হিসেব-নিকেশ, রাগ দ্বেষ, তর্ক-বালাইয়ের অবসানের কথা। কবিতা শেষ হয়েছে সেই শান্তির কথা বলে, যে কথা প্রথম স্তবকের শেষে শুনি 'বলো শান্তি, বলো শান্তি, /দেহ-সাথে সব ক্লান্তি / পুড়ে হোক ছাই।।'

'সাধনা'-র এই শান্তি' নামাঙ্কিত কবিতায় জীবনের অবসানে সমস্ত জাগতিক সম্পর্কের অবসানের কথা আছে। যেহেতু মৃত্যুর শেষের শান্তি'ই কবির লক্ষ্য তাই, জাগতিক সম্পর্কের খুঁটিনাটি কথা এখানে নেই। বরং মৃত্যুর পরপারের জীবনে অপার শান্তির আশ্বাসবাণী; অল্পকথায় এই শান্তির বাোধ প্রাধান্য। পেয়েছে বলেই কবিতার নাম হয়েছিল শান্তি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবিতার নামই শুধু পরিবর্তন করে 'মৃত্যুর পরে' রাখা হয় নাই, সংযোজিত হয়েছে পুরোনো কবিতার দ্বিগুণ সংখ্যক স্তবক।

এসেছে জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন রহস্য নিয়ে কবির কিছু প্রশ্ন, কিছু ভাবনা ও তার রাবীন্দ্রিক উত্তরও। অষ্টম ও নবম স্তবকে কবি যেন সেই প্রশ্নই তুলেছেন

"কেন এই আনাগোনা / কেন মিছে দেখাশোনা / দুদিনের তরে,

কেন বুকভরা আশা / কেন এত ভালোবাসা / অন্তরে অন্তরে, কিংবা

অথবা,

"জীবনে যা প্রতিদিন / ছিল মিথ্যা অর্থহীন / ছিন্ন ছড়াছড়ি

মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি / তারে গাঁথিয়াছে আজি / অর্থপূর্ণ করি—"

আরও লক্ষণীয় দুটি স্তবকেরই পক্তিটি শেষ হয়েছে একটি করে ড্যাস চিহ্নে। কবি এই প্রশ্ন তাহলে কারও কাছেই রাখছেন না, অথবা এ প্রশ্ন আসলে তাঁর অন্তরের উপলব্ধি মাত্র। তাই এ প্রশ্নের উত্তরও মিলেছে পরবর্তী তিনটি স্তবকে—

'চিরকাল এই-সব / রহস্য আছে নীরব /রুদ্ধ ওষ্ঠাধর;

জন্মান্তের নবপ্রাতে / যে হয়তো আপনাতে/ পেয়েছে উত্তর।।" (স্তবক - দশ)

"সে হয়তো দেখিয়াছে / পড়ে যাহা ছিল পাছে / আজি তাহা আগে,

ছোটো যাহা চিরদিন / ছিল অন্ধকারে লীন/ বড়াে হয়ে জাগে।" (স্তবক - এগারো)

এর পর ত্রয়োদশ স্তবক থেকে পঞ্চদশ স্তবক কবি মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে নতুন এক বোধে ভীত হয়েছেন। প্রিয়জনকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন মনের মত সংকীর্ণ বিচারবোধ ও সাংসারিক কাজ কর্ম ভলে বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির উদার অসীমের দিকে তাকাতে। প্রকৃতির অসীম উদার সহজ গতিময় প্রবাহের সঙ্গে মত প্রিয়জনকে তিনি মিশিয়ে নিতে বলেছেন। বলেছেন বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে অখণ্ড করে দেখতে

"ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে / দেখো তারে সর্ব দৃশ্যে / বৃহৎ করিয়া

জীবনের ধূলি ধুয়ে /দেখো তাকে দূরে থুয়ে / সম্মুখে ধরিয়া।" (স্তবক-পনেরো)

আবার ষোড়শ স্তবক থেকে ঊনবিংশ স্তবকে কবি ফিরে গেছেন সেই পুরাতন প্রসঙ্গে। প্রিয়জনকে প্রবোধ দিয়েছেন ওই মৃত মানুষের জন্য শোক করা বৃথা। "বৃথা তারে প্রশ্ন করি,/ বৃথা তারে পায়ে ধরি । বৃথা মরি কেঁদে,"– তাই মৃত্যুর পিছনে না ছুটে, পার্থিব জগতের শোক-দুঃখ ভুলে অনন্ত অসীমের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন। সেখানেই পাওয়া যাবে সান্ত্বনা।

দেখা গেল কবিতাটিতে সংযযাজিত আকারে শান্তির বোধ নয়, মৃত্যুর পরপারের জীবনরহস্য নিয়ে দার্শনিক বোধের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'সাধনা'র সংক্ষিপ্ত রূপে - মৃত ব্যক্তিকে অনন্ত অসীমে পথ খুঁজে পরিভ্রান্ত হতে দেখেছি, এখানে বরং কবি ভেবেছেন জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয়তো জীবন রহস্যের উত্তর পেয়েছে। আবার ঝিল্লির গানে / তরুর মর্মরে / নদীর কলস্বরে – প্রকৃতির উদার বিশ্বব্যাপ্ত অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যুর পরপারের জীবনকে দেখার চেষ্টায় কবিতাটিতে 'চিত্রা'র পরিচিত বিশ্বচেতনাটিও যুক্ত হয়ে গেছে। ফলে কবিতাটি পূর্বরূপে যেখানে মৃত্যুর পরপারে 'শান্তি'ই বড়ো হয়েছিল, সেখানে সংযোজনের ফলে মৃত্যুর পরের জীবনের রহস্যই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই পরিবর্তিত নামকরণটিও সার্থক হয়েছে।

কবিতাটিতে বৈচিত্র্য এসেছে বেশি। এ-বৈচিত্র্য ভাবনার গভীরতায় । পার্থিব জীবনের সাংসারিক সুখ দুঃখের পরিবর্তে বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার কথা, দার্শনিক বোধের গভীরতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য আরও বেড়েছে। তৃতীয় স্তবকে মৃত্যুকে কবি যখন প্রকৃতির আলো অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে এই কথা বলেন

"বিশ্বের আলোক যত / দিগ্বিদিকে অবিরত / যাইতেছে বয়ে,

শুধু ওই আঁখি' পরে /নামে তাহা স্নেহভরে অন্ধকার হয়ে।

জগতের তন্ত্রীরাজী / দিনে উচ্চে উঠে বাজি / রাত্রে চুপে চুপে

সে শব্দ তাহার পরে /চুম্বনের মতো পড়ে / নীরবতারূপে।"

এখানে আলোকের স্নেহভরে অন্ধকার হয়ে মৃতের চোখে নেমে আসা কিংবা শব্দের নীরবতারূপে চুম্বন হয়ে মৃতের ঠোটে চুপে চুপে নেমে আসার চিত্রকল্পদুটি মৃত্যুকে অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। তাই কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে 'শান্তি' অপেক্ষা 'মৃত্যুর পরে' অনেক বেশি সৌন্দর্যশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে সংযোজনের গুণে।।

১০.৩ ‘চিত্রা’র আঙ্গিক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্র-কবিতার যথার্থ স্বকীয়তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘মানসী’ থেকে। বাংলা কবিতার আঙ্গিক রচনায় প্রথম আধুনিকতার সূচনাও হয়েছিল ‘মানসী’তেই। বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন কীভাবে ছন্দ, মিল, ধ্বনিস্পন্দন, পংক্তিরচনা, স্তবকসজ্জা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছেন। ‘মানসী’-তে যার সূচনা হয়েছিল ‘চিত্রা’-তে তাই আরও বেশি উজ্জলতা নিয়ে, আরও বৈচিত্র্য ও গভিরতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রে ‘মানসী’তে বৈচিত্র্য ছিল, এখানে মূলত তারই অনুসরণ ঘটেছে, কিন্তু কবির অভিজ্ঞ প্রৌঢ় হাতের ছোঁয়া সেগুলির মধ্যে স্পষ্ট। ‘চিত্রা’র অহংকার তার ঐশ্বর্যময় কল্পনার গভীরতায় এবং ভাষাভঙ্গিতে। বিশেষ করে সৌন্দর্যভাবনার মধ্যে যে রূপজ অবয়বের উপস্থিতি চিত্রা’র কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে উঠেছে। শুরুতেই আমরা ‘চিত্রা’র ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করব। তার আগে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে লেখা একমাত্র কবিতা ‘আবেদন’ বিষয়ে দু-এক কথা বলা আছে।

‘আবেদন’ কবিতাটি রবীন্দ্র কবিতার ধারায় প্রথম সচেতনভাবে স্বতন্ত্র গঠন-রীতি অনুসরণ করেছে। ভৃত্য এবং রানির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে লেখা কবিতাটি বলা যায় প্রথম সংলাপরীতির কবিতা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বহু আগে ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ লিখেছেন, কিন্তু সে ছিল গীতিনাট্য। অবশ্য আবেদন রচনার সামান্য আগে রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১২৯৯ব.) নাট্যকাব্য এবং ‘বিদায় - অভিশাপ (১৩০১ব.) লেখেন। এই তিনটি গ্রন্থের কাহিনিই পৌরাণিক কাহিনি এবং তা মূলত কাহিনি-কাব্য। ‘চিত্রাঙ্গদা’কে রবীন্দ্রনাথ ‘কাব্য’ বললেও বা ‘বিদায় অভিশাপ’কে – ‘কবিতা ও কাব্য’ বললেও রবীন্দ্রনাথ এই দুটি কাহিনিতে নাট্যরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেদিক থেকে আবেদন প্রথম সংলাপ রীতিতে লেখা খণ্ড কবিতা (অঘ্রাণ ১৩০২ব.)। এর উৎসও পৌরানিক কাহিনি থেকে নেওয়া নয় ‘চিত্রা’ পর্বে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা ভৃত্য ও রানির সংলাপ-পরম্পরায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকীয়তার লক্ষণ এখানে শুধু সংলাপ-রীতিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকীয়তার আরও যে সব লক্ষণ, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, ঘটনার

দ্বন্দ্ব, সে সব এখানে নেই। তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এখানে ভৃত্যের 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'- এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কবির নিষ্কাম প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনার গভীরতাই প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই যথার্থ অর্থেই এটি কবিতা, খণ্ড কবিতা। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, কথা ও কাহিনী'তে যে নাট্য কাব্যের ধারাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছে, কবিতাটি যেন সেই ধারারই উৎস-মুখ। সে দিক থেকে 'চিত্রা'-য় এই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১০.৪ ছন্দ-বৈচিত্র্য

'চিত্রা'য় দুধরনের ছন্দোরীতি ব্যবহৃত হয়েছে (১) মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দোরীতি এবং (২) কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দোরীতি। 'মানসী'তে প্রাধান্য পেয়েছিল কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি। মাত্রাবৃত্র ছন্দ নিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু চিত্রা'য় মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরাতির সঙ্গে কলাবৃত্ত রীতির নানান বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু পর্ব বিভাজনের ক্ষেত্রেই নয়, অভিনব পঙক্তি-সজ্জা, ধ্বনিস্পন্দন, স্তবক বিন্যাসে নতুনত্ব, মিলের সুচারু অভিনবত্ব এই রীতির কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে মিশ্রবৃত্ত পয়ারের বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো। 'সুখ', 'জ্যোৎস্নারাত্রে' 'প্রেমের অভিষেক', সন্ধ্যা', 'ব্রাহ্মণ', 'পূর্ণিমা', 'আবেদন', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এবং 'বিজয়িনী' - এই নটি কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে আট ও ছয় মাত্রার সমিল প্রবহমান। পয়ার। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতাকে বজায় রেখে অন্ত্যানুপ্রাসের সাহায্যে অন্তমিলের প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজস্বতা তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন—

"শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়

হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমা যামিনী! অতিশয়

উদ্ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত

বারম্বার, তুমি এসো মিষ্ঠি অশ্রুপাত

দগ্ধ বেদনার পরে।"

(জ্যোৎস্নারাত্রে)

অথবা

"অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে

অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে

নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষিপুত্রগণ

মস্তকে সমিধভার করি আহরণ

বনান্তর হতে;

('ব্রাহ্মণ)

আট, ছয় মাত্রার এই সমিল পয়ারের অন্তমিল লক্ষণীয়। প্রথম উদাহরণটিতে তিন মাত্রার পদের সঙ্গে চার মাত্রার পদের অন্তমিল। দ্বিতীয়টিতে সরস্বতী তীরে'-র সঙ্গে 'ফিরে' বা 'ঋষিপুত্রগণ' এর সঙ্গে 'আহরণ' বাংলা প্রচলিত মিল বিন্যাস থেকে একটু স্বতন্ত্র, বলা চলে স্বভাববিরুদ্ধ। এই সমিল প্রবহমান পয়ারের ঢঙ কিন্তু কৃত্তিবাসীয় তো নয়ই, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের থেকেও স্বতন্ত্র, বলা চলে তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। এই ছন্দেরীতির প্রবহমানতার মধ্যেই এমন এক শক্তি রয়েছে যাকে অনায়াসে নাট্য-সংলাপে ব্যবহার করা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা'য় কবি সেই পরীক্ষা প্রথম করেছিলেন, এখানেও দেখলাম তার প্রয়োগ আবেদন কবিতায় ভৃত্য ও রানির সংলাপে

"রানি। অবোধ ভিক্ষুক

অসময়ে কী তোরে মিলিবে?

ভৃত্য। হাসিমুখ

দেখে চলে যাব। আছে দেবী, আরো আছে--

নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে

নানা জনে, এক কর্ম কেহ চাহে নাই।

ভৃত্য, পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই--

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।”

প্রবহমানতার স্বাধীনতা এখানে এতটাই শক্তিশালী যে রানির সংলাপের প্রথম চরণের অন্তপদ ‘ভিক্ষুক’ এর সঙ্গে ভৃত্যের সংলাপের ‘হাসিমুখ’কে অনায়াসে মিলিয়ে দিয়েছেন কবি।

‘চিত্রা’র একটি মাত্র কবিতাতেই আট ও দশ পর্বের সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি ‘এবার ফিরাও মোরে’। বাস্তবের রূঢ়তা ও উদ্দীপিত ভাবের যে জোরালো প্রকাশ কবিতাটিতে আছে, তাকে সার্থকভাবে সংশ্লেষণ করেছে এই ছন্দ। যেন শক্তিশালী গদ্যেরও বাহক এই কবিতা। লক্ষণীয় এই পঙক্তিগুলি—

“বাহিরিনু হেথা হতে

উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে

জনতার মাঝখানে ”

কিংবা

“কোন্ অন্ধ কারামাঝে জর্জর বন্ধনে

অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান

অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া!”

‘উন্মুক্ত’, ‘জর্জর’, ‘বন্ধনে’, ‘অক্ষমের’, বক্ষ, রক্ত’, ‘লক্ষ মুখ’ - শব্দগুলির ধ্বনিস্পন্দন এই চরণগুলিকে কবিতার উদ্দীপিত ভাবের ভাবের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে। |

চিত্রা’র কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে লেখা কবিতাগুলিতে বৈচিত্র্য এসেছে নানাভাবে। কখনও তা মিলবিন্যাসে, কখনও স্তবকসজ্জায় কখনো ধ্বনিস্পন্দনে কিংবা পঙক্তি সজ্জার

অভিনবত্বে। 'মৃত্যুর পরে' ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও দই মাত্রার প্রান্তিকপর্বে, অন্তমিলের সরল স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে গেছে। কবিতার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে শাক ও সান্তনার করুণভাবটি এই ছন্দে সুন্দর ফুটে উঠেছে। দুঃসময় এরকম আর একটি কবিতা। চার পঙক্তির এক একটি স্তবকে প্রথম তিন পঙক্তিতে অন্যমিল রয়েছে (দ্বার' / 'অন্ধকার' / হাহাকার') শেষ । পংক্তির সঙ্গে মিল রয়েছে পরবর্তী স্তবকের শেষ পঙক্তির (ফিরিয়া মরে' / 'কী মনে করে')। মাত্রাবৃত্তের আর একটি সুন্দর কবিতা 'দুরাকাঙক্ষা'। ছয় মাত্রার পর্বে রচিত চার স্তবকের এই ছোটো কবিতাটিতে প্রতি দ্বিতীয় পঙক্তিতে একটি করে অতিপর্বের ব্যবহার কবিতার ছন্দঃস্পন্দে সরল বিন্যাসের হেরফের ঘটিয়েছে—

"কেন নিবে গেল বাতি?

আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে

জাগিয়া বাসররাতি

তাই নিবে গেল বাতি?"

প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দ 'কেন' শেষপংক্তির শেষ শব্দ 'তাই' প্রশ্ন উত্তরের ভঙ্গিতে গোটা স্তবকটিকে যেন একই সুরে বেঁধে রেখেছে।

দুটি আট মাত্রার পূর্ণ পর্বে গঠিত একটি চরণ এবং চোদ্দো মাত্রার পরবর্তী চরণে রচিত 'স্নেহস্মৃতি কবিতাটি। এই সরল সমীকরণে রচিত হলেও কবিতাটির শুরুর পাঁচটি চরণ কিন্তু কোনাে চলতি সমীকরণের মধ্যে পড়ে না—

"সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল,

কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে

জল আসে আঁখি পাতে।

হৃদয় আকুল।।

সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল।।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে প্রাতে / হাতে / পাতে এই অন্তমিলের পরেই, পরের ছয় মাত্রার চরণে 'আকুল', প্রথম চরণের 'বেল ফুল'-এর সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলে যায়। শেষ চরণে আবার ফিরে আসে প্রথম চরণটি। সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল' একটা অনুরণন সৃষ্টি করে, যা সমগ্র কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

একই রকম কলাবৃত্ত ত্রিপদীতে রচিত 'শেষ উপহার', কিন্তু মিল বিন্যাসের চমৎকারিত্বে কবিতাটি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়—

"যাহা কিছু ছিল সব দিন শেষ করে

ডালাখানি ভরে

কাল কী আনিয়া দিব যুগল চরণে

তাই ভাবি মনে"

করে / ভরে এবং চরণে/ মনে -এই মিত্র যখন মনের মধ্যে গেমে যায়, তখনি বিপর্যয় ঘটে যায় পরবর্তী চারটি চরণে--

"বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে

তরু তার পরে।

একদিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে

চাহে রিক্ত করে।"

এখানে অন্তমিল কিন্তু পূর্ববর্তী চারটি চরণের অনুসরণ করেনি। অথচ প্রথম দুই চরণের অন্তমিল কে ফিরিয়ে এনে (পরে / করে) পাঠককে চমকিত করে দেয় এই কবিতা।

স্তবকবিন্যাসে, মিল ও পঙক্তি সজ্জায় অভিনবত্ব নববর্ষে', 'ব্যাঘাত', প্রভৃতি কবিতাতেও দেখা যায়। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিক নির্মাণে পরীক্ষানিরীক্ষার শেষে প্রৌঢ়

অভিজ্ঞতার মুনশিয়ানা ধরা পড়েছে। 'নববর্ষ' কবিতায় পঙক্তি-সজ্জা এবং মিল বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যাক

‘নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন

বর্ষ হয় গত।

আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন

করিলাম নত।’

চরণ চারটিতে একতিন (পুরাতন/ জীবন) দুই-চার (গত / নত) মিল-বিন্যাস রয়েছে, কিন্তু পরবর্তী চার চরণে কবি এই বাধা ছটের বাইরে গিয়ে চরণ সজ্জা ও মিলবিন্যাসে অভিনবত্ব নিয়ে এসেছে---

বন্ধু হও, শত্রু হও যেখানে যে কেহ রও

ক্ষমা করো আজিকার মতো

পুরাতন বরষের সাথে

পুরাতন অপরাধ যত।।

এখানে কিন্তু মাত্রা-বিন্যাসেও হেরফের ঘটেছে আট, আট ষোলো মাত্রার প্রথম পঙক্তিটি পরবর্তী পঙক্তিগুলি আবার দশ মাত্রা করে। প্রথম পঙক্তির দুটি পর্বে রয়েছে পবন্তিক মিল (হও /রও)। দ্বিতীয় পঙক্তির সঙ্গে চতুর্থ পঙক্তির চরণান্তিক মিল (মত/ গত) লক্ষণীয়। মোটামুটি আট পঙক্তির গুবকটির সাতটিতেই মিল, কিন্তু সপ্তম পঙক্তি পুরাতন বরষের সাথে আকস্মিকভাবে মিলহীন, যদিও শেষ তিনটি পঙক্তিই দশ মাত্রার। আকস্মিক এই মিলহীনতাই কবিতাটির চারুত্ব। তৃতীয় পঙক্তিতে যখন মিলের অপেহ্বায় আমরা আশান্বিত, সেই সময়েই ঘটে যায় এই বিপর্যয়। পঙক্তিটির মিলহীনতায় যে ধারাবাহিকতা বাধাপ্রাপ্ত হল, শেষ পর্ভূক্তিতে পুনরায় মিল এসে তাতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারলো।

‘উর্বশী’ কবিতাটিও তার অপুর্ব ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে সংগতি রেখে পঙক্তি সজ্জা ও মিল বিন্যাসে অপূর্ব মশুনশ্রী লাভ করেছে। নটি পঙক্তির স্তবকগুলিতে প্রথম দুই পংক্তির মাত্রা আট+দশ দশ, তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পংক্তি আট + দশ- মাত্রার। আর শেষ তিন পঙক্তি যথাক্রমে ছয়, আট ও ছয় মাত্রার। মিল এক/দুই, তিন/চার, পাঁচ/ছয়/সাত আট/নয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙক্তির অন্তমিল। ৮ও১০ মাত্রার পংক্তি চারটি যখন অমিল বিন্যাসে এগিয়ে চলেছে, আকস্মিকভাবে সপ্তম পংক্তিটি ছয় মাত্রায় থেমে। গেল। অথচ তার পূর্ববর্তী পক্তির সঙ্গে অন্তমিল বজায় রাখল

নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।

পূর্ববর্তী চারটি সমিল প্রবহমান পয়ার পঙক্তি সরল রৈখিক চলনকে হঠাৎই ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হল ওই ছয় মাত্রার ছোট্ট পংক্তিতে। তারপরে চোদ্দো ও ছয় মাত্রার দুটি পঙক্তি উর্বশীর উপমাকে বারেবারে ফিরিয়ে এনেছে।

পঙক্তি সজ্জায় অবাধ স্বাধীনতা কবি নিয়েছেন ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটির ক্ষেত্রে। দশ, আট, ও ছয় মাত্রার পর্বগুলি এক একটি স্তবকে এক এক রকম বিন্যস্ত হয়েছে। তিনটি স্তবক যেন ভিন্ন তিন কবির হাতে সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি স্তবকের প্রথম চার পঙক্তির তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে

স্তবক - এক	স্তবক - দুই
আজি হতে শতবর্ষ পরে	তবু তুমি একবার খুলিয়া
দক্ষিণদ্বার	কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
বসি বাতায়নে	
কৌতুহলভরে	সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায়
অবগাহি	
আজি হতে শতবর্ষ পরে।	ভেবে দেখো মনে—

স্তবক - তিন

আজি হতে শতবর্ষপরে

এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি

তোমাদের ঘরে!

আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন

পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে—

'১৪০০ সাল' কবিতার এই পঙক্তি সজ্জা আসলে তার ভাবের প্রবাহকে ছায়িত করার চেষ্টা। আজি হতে শতবর্ষ পরে'-র যে প্রজন্ম, সেই প্রজন্মের সঙ্গে কবি যেন ভাবের আদান-প্রদান করেছেন এই কবিতার ভাষায়। সংযত, সংহত পক্তিগুলি সৌকর্যময় করে কবি উপস্থাপন করেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ পাঠকদের কাছে। কবিতাটিতে চরণান্তিক মিলের পাশাপাশি পান্তিক মিলগুলি পাঠকের হৃদয় গুঞ্জরিত করে – 'সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি', 'চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি', 'নবীন ফাল্গুনদিন সকল বন্ধনহীন', 'উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা', 'সেদিন উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে', 'হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,' - ইত্যাদি পক্তিগুলি শতবর্ষ পরেও পাঠকের হৃদয়কে বসন্তের নব অনুরাগে রঞ্জিত করবে, তা বলা যায়।

'চিত্রা'-য় কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ তুলনায় কম প্রযুক্ত হলেও, তার মধ্যে নতুনত্বের অভাব ছিল না। অবশ্য 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি' এই দুটি কবিতায় কলাবৃত্তের প্রচলিত ছয়, ছয়, দুই মাত্রার পংক্তিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কাহিনি প্রধান এই কবিতাদুটির গল্পবলার ঢং এই ছন্দে সার্থকভাবেই ফুটে উঠেছে। জীবনদেবতা বিষয়ক সাধনা', সিন্ধুপারে', 'জীবনদেবতা' ও 'অন্তর্যামী' কবিতা চারটিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে 'সিন্ধুপারে' পরিচিত ছয়, ছয়, পাঁচ, দুই মাত্রার ছন্দোরীতিতে লেখা।

"পউষ প্রখর শীত জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি;

নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নিবর্ণদীপ বাতি।"

'সিন্ধুপারে'র রহস্যময় পরিবেশের স্বপ্নচিত্রগুলি এই ছন্দে সার্থকভাবেই ফুটে উঠেছে। চিত্রগুলি ধ্বনির সংযোগে প্রাণ পেয়ে উঠেছে।

'অন্তর্যামী'র ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দরীতিতে কবির নিজস্ব উদ্ভাবনা আছে। তবে এই রীতির পরীক্ষা 'মানসী'-র মধ্যেই দেখেছি। সেই তুলনায় 'জীবনদেবতা' ছয় মাত্রার পর্বে লেখা হলেও তা মিল বিন্যাসের সামান্য হেরফেরে একটু স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে –

"দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়

পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়

নিঠুর পীড়ণে নিঙারি বক্ষ

দলিত দ্রাক্ষাসম।

কত যে বরণ কত যে গন্ধ

কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ

গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন

বাসর শয়ন তব।"

লক্ষণীয় 'বক্ষ', 'বয়ন' - শব্দ দুটি চতুষ্ক যুথের এই তৃতীয় পর্ভূক্তির অন্তশব্দ দুটি মিলহীন রেখে কবি আসলে ধ্বনির ব্যঞ্জনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথম চতুষ্কের লক্ষ', 'দুঃখ' দ্বিতীয় চতুষ্কের 'বরণ' কিংবা গাঁথিয়া' জাত গাঁথন - যেন 'বক্ষ বা বয়ন' - এর সঙ্গে ধ্বনিসাম্যতা সৃষ্টি করেছে।

একটু স্বতন্ত্রভাবে বলার অপেক্ষা রাখে 'সাধনা' কবিতাটি। কবিতাটি যেন কবির জবানিতে কিছুটা নাটকীয়,

ব্যক্তির মতো। ছয় মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হলেও কখনও সাত, কখনো পাঁচ মাত্রার পর্ব এনে বৈচিত্র সষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রতি স্তবকের চারটি চতুষ্কের পর পঞ্চম চতুষ্কের আগে তিনটি ক বিন্যস্ত করে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটার মতোই ঘটনা ঘটিয়েছেন

কবি। ‘মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ থের ধন / ব্যর্থ সাধনখানি’ - একথা শোনার পর যখন আমরা পূর্ববর্তী চতুষ্কের অনুসরণ হবে ভেবে অপেক্ষা করছি তখনই কবি সংলাপ থেকে সরে চলে এলেন। ধ্রুবপদের মতো অনুরণিত হল ব্যর্থ সাধনার

কথাই—

“ওগো ব্যর্থ সাধন খানি

দেখিয়া হাসিছে সার্থক ফল ।

সকল ভক্ত প্রাণী।”

কলাবৃত্ত ছন্দের একটি চমৎকার শ্রুতিমধুর কবিতা ‘দিনশেষে’। অন্তমিলের ধ্বনিসুষমায় এক কোমল কারুণ্য যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। ধরণী’ /তরণী'/ তরুণী’ কিংবা শয়নে /নয়নে/ কাননে/ কাঁকনে’ - অন্ত্যানুপ্রাসের এই ধ্বনিসাম্য কবিতাটির সহজ সরল ভাবরাজিকে এক সুরের মূর্ঘনায় বেঁধে রেখেছে। শুধু মাত্র কাবৃত্তের পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্বে ও অন্ত্যানুপ্রাসের ধ্বনিসাম্যে সরল সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে ‘নারীর দান’ কবিতায়

“একদা প্রাতে কুঞ্জতলে

অন্ধ বালিকা

পত্রপুটে আনিয়াদিল

পুষ্পমালিকা!”

কবিতাটির ‘কুঞ্জতল’, ‘অন্ধ, ‘পুষ্প’, ‘অশ্রু’, ‘স্নিগ্ধ’, ‘অন্ধকার’, প্রভৃতি শব্দের চয়ন এবং তার বয়ন লক্ষ করার মতো। এগুলি শুধু মাত্রা সংখ্যাই বাড়ায়নি, পঙক্তিগুলির ধ্বনিগত সুষমাকে ধরে রেখেছে এরাই।

‘গৃহশত্রু’ কবিতায় ছয় মাত্রার পর্ব সজ্জায় কোনো চমৎকারিত্ব নেই, কিন্তু চমক আছে এর মিলবিন্যাসে। প্রতি স্তবকের দশটি পক্তির দুই/ছয়/আট/দশ পঙক্তিতে (সাজে /মাঝে / বাজে / লাজে) এবং তিন/চার/পাঁচ (ভুবন / পবন / ভবন) পঙক্তিতে

দুরকম ধ্বনির অন্তমিল আছে। মিল নেই প্রথম ও সপ্তম পঙক্তিতে যেখানে শুরুতে আছে একটি অতিপর্ব (আমি)। কিন্তু নবম পক্তিতে একটু স্বতন্ত্রভাবে পর্বান্তিক মিল দেওয়ায় শেষ চার পঙক্তিতে অপূর্ব ধ্বনিসুষমা সৃষ্টি হয়েছে—

"শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয় :

উলসি বিলসি নাচে,

উতলা পাগল করে কলরোল

বাঁধন টুটিলে বাঁচে।।"

প্রথম পঙক্তিতে 'র' ধ্বনি, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঙক্তিতে 'ল' ধ্বনির অনুপ্রাস কবি-হৃদয়ের উচ্ছলতাকে আশ্চর্য ধ্বনিময়তায় ব্যক্ত করেছে। সেখানে নাচে নৃত্যের ভঙ্গি ওই ধ্বনি কল্লোলে এতটাই তীব্র যে শেষ পংক্তিতে 'বাঁচে' যেন বাঁধন ছিড়ে ফেলার ইঙ্গিত দেয়।

'রাতে ও প্রভাতে' আর একটি চমৎকার কলাবৃত্ত ছন্দের কবিতা। অভিনব মিলবিন্যাসের সঙ্গে অপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্য কবিতাটির উৎকর্ষতার প্রধান দিক। কবিতাটির শব্দচয়নে কবির সচেতন লক্ষ করার মতো। যেমন ছয় মাত্রার শব্দ - মধুযামিনীতে / জ্যোৎসানিশিতে / কুঞ্জকাননে / চুম্বনভরা / ফেনিলোচ্ছল / অবগুণ্ঠন/ শুভ্রবসনা / শঙ্খবলয় জাহ্নবীতীর - শব্দগুলি প্রত্যেকটিই সমানবদ্ধ এবং ধ্বনিতরঙ্গিত। এরই পাশাপাশি দুই মাত্রার - করে। পরে / ভরে/ ধরে / টানি / পানি / মুখে / সুখে / পাশ / রাশ / রাজি / বাজি / সাজি / রেখা / লেখা / বেশে/ হেসে প্রভৃতি শব্দগুলি ওই ছয় মাত্রার ধ্বনি ঝঝনা শব্দগুলির পাশে অন্যতর আবেশ এনেছে। যেন উচ্ছল কলতরঙ্গিত কোনো ঝরনাধারা হঠাৎ গিয়ে মিশছে শান্ত সরোবরে। ধ্বনির কলতরঙ্গের এই বৈচিত্র্যে কবিতাটি নিজস্ব সুরে বেজে উঠেছে।

১০.৫ কাব্যসৌন্দর্য — অলংকার, চিত্রকল্প

'চিত্রা'-র কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভালো, যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। সেখানে ভাবনার গভীরতার

সঙ্গেই, ভাষা-শব্দ, ছন্দ অলংকার-চিত্রকলা জড়িয়ে থাকে। এমনকি তার সঙ্গে সংগীতের মূর্ঘনাও মিশে থাকে। কবিতার সৌন্দর্য এই সমস্তকে নিয়েই। তবু রূপনির্মাণ কৌশলের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলতে গেলে এর ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে আসে অলংকার ও চিত্রকল্পের কথা। ভাষা ও ছন্দ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে অলংকার ও চিত্রকল্পের আলোচনা থাকবে। চিত্রকল্প গড়ে ওঠে কবি-কল্পনার চমৎকারিত্বে। কবি যখন অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে শব্দ তুলে এনে গড়ে তোলেন এমন এক রূপাবয়ব যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে নাড়া দেয়। স্মৃতিতে জেগে ওঠে এক একটি ছবি। চিত্রকল্প গড়ে ওঠে অলংকার ব্যবহারের চমৎকারিত্বে। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার সুচারু ব্যবহারে চিত্রকল্প ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। চিত্রা'-র বহু কবিতাতেই এই জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্রকল্প দেখা যায় যা কবিতার কাব্যসৌন্দর্য নির্মাণে সবথেকে মূল্যবান উপকরণ হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই 'উর্বশী' কবিতার কথা বলি। এই নারীকে কবি কতভাবে, কত বিচিত্র কল্পনাকে ভেরেছেন— 'গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বণাঞ্চল টানি / তুমি কোনো গৃহ প্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি' সন্ধ্যাদীপ হাতে কোনো পল্লিনারীর মতো উর্বশী নয়। সে গৃহকল্যাণলক্ষ্মী নয়। তার বিকাশ বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি' - উপমার এই সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উর্বশীর পৌরাণিক পরিচয়ের কয়েকটি অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন কবি। স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর প্রধান দায়িত্ব শরীরী রূপ ও কামবিলাসের সাহায্যে দেবতাদের চিত্তবিনোদন ছাড়াও দেবতাদের প্রয়োজনে অন্যদের মোহিত করে কার্যসিদ্ধি করা। সেই চিত্রকল্পই এখানে ফুটেছে।

ক) 'তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।

তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে"

খ) 'তব স্তন হার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,

অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা

নাচে রক্তধারা'

গ) 'দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে'

চিত্রকল্পগুলি একই সঙ্গে, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কাজ করছে। প্রতিটি বর্ণনায় উর্বশীর তুলনাগুলিতে প্রকৃতির কথা এসেছে 'ত্রিভুবন', 'অন্ধ বায়ু বহে', নভস্তলে খসি পড়ে তারা', 'দিগন্তে মেখলা' - অর্থাৎ উর্বশীর শরীরী রূপ যেন সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতিতে সঞ্চারিত। তাই লোক-লোকান্তরে ব্যাপ্ত তার রূপ ও সৌন্দর্যকে ধরা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রথম স্তবকে 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা এবং শেষ স্তবকে 'অস্তাচলবাসিনী উর্বশী' - উষা থেকে গোধূলি নৈসর্গিক উপমাগুলি উর্বশীর জন্মবৃত্তান্তের পৌরাণিকতাকেও ব্যঞ্জিত করেছে। গন্ধর্ব-কন্যা বলেই উষার মতো তার আবির্ভাব, সুতরাং তার না ফেরার স্মৃতিও নৈসর্গিক কারণে 'অস্তাচলবাসিনী' হয়েছে।

'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতায় জ্যোৎস্নাধারাকে কবি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায়

"পাণ্ডুর অম্বর হতে

ধীরে ধীরে এসো নামি লঘু জ্যোৎসাস্রোতে,

মৃদুহাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া

নির্জন শিয়রতলে।"

বর্ণহীন ধূসর আকাশ থেকে জ্যোৎসারমণীর মর্তে কবির শিয়রতলে এসে দাঁড়ানোর ছবিটি আরও স্পর্শময় । গন্ধময় হয়ে ওঠে পরবর্তী বর্ণনায় - 'বেড়াক ভাসিয়া / রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী সমীর হিল্লোলে' এবং তোমার অঞ্চল / বায়ুভরে উড়ে এসে পুলক চঞ্চল। জ্যোৎস্নারমণীর শরীরী স্পর্শের আকাঙ্খাও কবি করেছেন

"একটি চুম্বন

ললাটে রাখিয়া দাও একান্ত নির্জন

সন্ধ্যার তারার মততা;"

অথবা -

"আলিঙ্গন স্মৃতি।

অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি

বাজায়ে শিরার তন্ত্রে।"

নির্জন সন্ধ্যাতারার মতো চুম্বন অথবা অনন্তের গীতির মতো আলিঙ্গনের সুরতরঙ্গ এসমস্তই লৌকিক শরীরী ভোগ-আকাঙক্ষাকে ছাড়িয়ে কামগন্ধহীন লোকাতীত স্পর্শ আকাঙক্ষাকে ব্যক্ত করেছে।

প্রেমের অভিষেক কবিতায় কবি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণকে প্রেমের স্বর্গীয় আবির্ভাবে স্বর্গ করে তুলেছেন। তাই অমর বীণায় উঠিয়াছে কী ঝংকার' – পরবর্তী স্তবকে প্রেমের অমরাবতী'কেই প্রস্ফুটিত করে তোলে। সৌন্দর্যের নন্দনভুমি নেমে আসে তার গৃহের অন্তঃপুরে। প্রেমও হয়ে ওঠে স্বর্গীয়। শেষ স্তবকে প্রেয়সার ভালোবাসার চিত্রকল্পগুলিও স্বর্গীয় লাবণ্যমাখা

১। রেখেছি যতনে, / তব সুধাকণ্ঠ বাণী

২। তোমার চুম্বন । ... রেখেছে যেমন সুধাকর । দেবতার গুপ্ত সুধা

৩। কমলার / চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার / সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট'

পুরাণের রাজ্য থেকেই চিত্রকল্পগুলি আহরণ করেছেন কবি। ভূতলকে করতে চেয়েছেন স্বর্গখণ্ড।

'সন্ধ্যা' কবিতায় বিপরীতভাবে চিত্রকল্পের উপকরণের জগতটি কিন্তু একান্তভাবে মতের জগৎ। মতের। সীমাকেই এখানে চিত্রকল্পের চারুত্বে অসীমতায় প্রসারিত করেছেন কবি। কবিতাটি যেন ছবির অ্যালবামে গাঁথা—

"হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে

সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে

শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;"

পল্লিগ্রামের এই ছবি এগিয়েছে গৃহকার্য সেরে গ্রাম্য বধূর বেড়াখানি ধরে দাঁড়ানো চিত্রে—

“কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি

সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি

ধূসর সন্ধ্যায়।”

এই চিত্র বর্ণনা মাত্র, এখানে কোনো কবিতা নেই। কবিতা প্রাণ পেয়ে উঠল ঠিক এর পরেই, পরবর্তী স্তবকে

“অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে

বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,

দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি

দিগন্তের পানে;

সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগে এই ছবি হয়ে উঠল পরিপূর্ণ চিত্রকল্প। বাস্তব জগতের উপর ভিত্তি করেই কল্পনার জগতকে প্রাণময় করে তুলেছে। বসুন্ধরার মধ্যে জননীসত্তা আরোপিত হওয়ায় কবিতাটি নিতান্ত চিত্র থেকে মূর্তিতে রূপ পেয়েছে।

‘আবেদন’ কবিতায় ভৃত্য তার রানির রাজ্যের ঐশ্বর্য তথা নিসর্গ পরিবেশ এঁকেছেন, তা কোনো বাস্তব পরিবেশ নয়— রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল / তোমার ‘প্রাসাদসৌধ’, ‘অনিন্দ্যনির্মল / চন্দ্রকান্তিমণিময় বিজনে বিরলে’, মঞ্জরিত ইন্দুমী বল্লরীবিতানে | ঘনচ্ছায়, নিভৃত কপোতকলগানে / একান্তে কাটিবে বেলা ইত্যাদি পঙক্তিকটিতে বিশেষণগুলি সমস্তই নৈসর্গিক চয়ন। সৌন্দর্যবোধের চরম প্রকাশ এখানে আছে। ‘বিজয়িনী’ কবিতায় নারীদেহের বর্ণনায় যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অপার্থিবত্ব ফুটে উঠেছে, কবিতার কাব্যসৌন্দর্য সেই বর্ণনার গুণেই। অচ্ছোদসরসীনীর’– স্বর্গের উপকণ্ঠে যেন ঝরনাধারার মতো ফুটে ওঠে প্রথম বাক্যটিই। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিসর্গের বর্ণনা এবং বিজয়িনীর শরীরী সৌন্দর্যের বর্ণনাও যেন মতসম্ভোগের ঊর্ধ্বে। যেমন—

“লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ

মৌন অপমানে;

এখানে প্রতীয়মান- উৎপ্রেক্ষা অলংকারে মেখলাকে রমণীর শরীরী সম্পর্কে নিবিড় করে তোলায় আশ্চর্য সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের আরও দু-একটি উপমা

১। "বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি,

ত্যাজিয়া যুগল স্বর্গ"

২। "যেন আকাশবীণার

রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীতঝংকারে কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মৌন স্তব্ধতারে

বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া।"

৩। বহু বনগন্ধ বহে।

অকস্মাৎ শ্রান্ত বাহু উত্তপ্ত আগ্রহে

লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে

মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

৪।"ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে

ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে

বিমুগ্ধনয়ন মৃগ;"

৫। "ছায়াখানি রক্ত পদতলে

চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া--- "

এই ধরনের চিত্রকল্প 'চিত্রা'-র মধ্যে অনেক পাওয়া যাবে। কয়েকটি কবিতার সৌন্দর্য অনেকাংশে এই চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতায় পরিস্ফুট হয়েছে। কবিতায় এই চিত্রকল্পের প্রয়োগ আমাদের ইন্দ্রিয়জগতকে জাগিয়ে তোলে। কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এই ধরনের প্রয়োগ তাই যে কোনো কবিতার ক্ষেত্রেই বহু মূল্যবান। ব্রাহ্মণ' কবিতায় সকাল হওয়ার মতো সাধারণ একটি নৈসর্গিক ঘটনাকে অসাধারণ লাবণ্যময় করা

হয়েছে এইভাবে-- ‘পরদিন / তপোবনতশিরে প্রসন্ন নবীন / জাগিল প্রভাত”। গাছের মাথায় প্রভাত সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ ওই 'নবীন জাগিল' শব্দযুগে যেন শিশুর সদ্য জেগে ওঠার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। আবার যত তাপসবালক, / শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক’– এখানে বালকগুলি তাপসবালক, তাদের উপমা শিশিরে স্নাত প্রভাত সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল। এই উপমা না হলে তাদের ‘তাপসবালক’ বলে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যেত কী? ‘দিনশেষে’ কবিতায় আশ্চর্য একটি পঙক্তি - ‘কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।’ - অনুপ্রাসের ধ্বনিসাম্য আগেই পক্তিটির ব্যঞ্জনা কিন্তু অনুপ্রাসে নয়। বিজনে পথের মাঝে পল্লিবধূরা পিতলের করে নদী থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে কক্ষে কলশ নিয়ে। এক হাতে ধরা তাদের কলশির গায়ে কঙ্কণগুলি ঠেছে; ফলে কলশির গায়ে যে শব্দসৃষ্টি হচ্ছে কবির মনে হচ্ছে, কলশি করুণ সুরে বেজে উঠছে ওই কঙ্কণের ছোঁয়া পেয়ে। এরকম দু-একটি পঙক্তি অন্য কবিতাতেও লক্ষ করা যায়। যেমন—

১। “নদী বহি চলে কাঁদি একাকিনী

আপনার কলকলে” - (গৃহশত্রু’)

২। “কাননে প্রাসাদ চূড়ে নেমে আসে রজনী,” (দিনশেষে’)

৩। “কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়

কত অনুরাগে” (১৪০০ সাল)

৪। “ভবনদীতীরে হৃদিমন্দিরে

দেবতা বিরাজে,” (নীরব তন্ত্রী)

৫। “যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে

একদিন ছুটেছিনু;” (প্রৌঢ়)

১০.৬ রবীন্দ্র কবিতার প্রেক্ষিতে ‘চিত্রা’র স্থান

ক্ষুদিরাম দাস তাঁর রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় গ্রন্থে ‘চিত্রা’- গ্রন্থটিকে সমগ্র রবীন্দ্র কবিতার প্রেক্ষিতে কবির প্রতিভার বিকাশ-রূপ হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন – “... এই কাব্যেই পূর্বোক্ত বিভিন্নমুখী রোমান্টিক প্রবণতাগুলির পূর্ণতা দেখা গেছে এবং ভবিষ্যতের অতিমহান পরিণতির আভাস সূচিত হয়েছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিণতির মুখে ধাবমান।

সমালোচক প্রমথনাথ বিশীও ‘চিত্রা’-র মধ্যে কবিপ্রতিভার দ্বন্দ্বকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ রূপে দেখেছেন। বস্তুত, চিত্রা’ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবি জীবনের বিকাশ পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন যে কবিতা-চর্চা করেছেন, তার গুরুত্ব পরিমাপ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শৈশব সংগীত সন্ধ্যা সংগীত’ থেকে শুরু করে শেষ লেখা পর্যন্ত তাঁর কবিতা রচনার ইতিহাস নানা পরিবর্তন, নানা বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে দিয়ে একটি চরম পরিণামে গিয়ে পৌঁছেছে। নানা পালাবদলের ফাঁকে ঋতু পরিবর্তনের মতোই দেখা দিয়েছে কবিতার নতুন নতুন পুষ্প-কানন। সে পুষ্পকাননে ফুটে উঠেছে নানা বিচিত্র পুষ্প। এই সুবিপুল সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যময়তার মধ্যেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের কিছু সাধারণ ঐক্যসূত্র আছে। তাকে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিগত কবি-কল্পনার তীব্র গভীর অনুভূতির আলাোকে পারিপার্শ্বিক জীবনকে দেখা ও বিশ্ববাোধের গভীর উপলব্ধিকে প্রকাশ করা। অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বভাবের মধ্যে কবিপ্রকৃতি, তপস্বী প্রকৃতি, ত্যাগী প্রকৃতি, ভাোগী প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও সমন্বয়কে দেখেছেন এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থে বা একটি মাত্র পর্বে ফুটে উঠেছে তা নয়। আবার কোনো একটি কবিতাগ্রন্থে যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্জিত হয়েছে তাও নয়। সে দিক থেকে ‘চিত্রা’ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির অংশ আবার সেই সমগ্রের অংশ হিসেবে সে রবীন্দ্র কবিমানসের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্যাস।

বস্তুত, ‘চিত্রা’ থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উত্তরণের সোপানটি ক্রমশ সাবলীল ও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ‘মানসী’-তে তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল কিন্তু চিত্রা’তে তার পূর্ণতর রূপ। রবীন্দ্রনাথ কবিতা - সাধনার সমস্ত লক্ষণই চিত্রায় স্পষ্ট। বিশেষ করে যে গভীর কবি-কল্পনা, বিশ্বজীবনের তথা মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিচেতনাকে দেখা, প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে দিয়ে জীবন রহস্য অনুসন্ধান এবং বিশ্বজীবন ও ব্যক্তিধর্মের নানা বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্ব ও বিরাোধের বাস্তবতাকে স্বীকার করেও এক সমন্বয় - আদর্শের অনুসন্ধান – এ সমস্ত কিছুই চিত্রা’র কবিতাগুলিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিত্রা’কে দেখা সম্ভব নয়। বরং বলা যেতে পারে যৌবনের রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথে পরিণতির পথে সব থেকে উল্লেখযোোগ্য সংযোগ-সেতুটি ছিল ‘চিত্রা'।

১০.৭ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের স্বরূপ ‘চিত্রা’-র বিভিন্ন কবিতায় কীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

২। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কবিতা অবলম্বনে ‘চিত্রা’-র কাব্য সৌন্দর্যের পরিচয় দিন।

৩। ‘চিত্রা’-র কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। রবীন্দ্র কবিতার প্রেক্ষিতে ‘চিত্রা’-র স্থান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ‘চিত্রা’ এবং রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক বিশ্বভারতী, ৪র্থ সং ১৩৭৭ ৪র্থ সং ১৩৮৩, ৩য় সং, ১৩৯৭, ৩য় সং ১৪০১ব. (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড)

৩। প্রশান্তকুমার পাল - ‘রবিজীবনী’ (তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, ১৩৯৫ব.

৪। জগদীশ ভট্টাচার্য - কবিমানসী' (প্রথম খণ্ড) ভারবি, ১৯৯৭

৫। সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড) ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৬ব:, ১৩৮৩ ব. ১৯৭৬ ৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী - রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিক্রমা’, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯০ব,

৬। প্রমথনাথ বিশী – ‘রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ’, মিত্র ও ঘোষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৭৩ব.

নীহার রঞ্জন রায় - রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, দি বুক এম্পোরিয়াম, ২য় সং ১৩৫১ব,

৭। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় - রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা’ (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯, নূতন সংস্করণ ১৩৯৩ব.

৮। শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত - রবীন্দ্রনাথ’, যতীন্দ্রলাল নন্দী, ১৩৪১ব,

৯। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য - রবিরশ্মি

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা’, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৪র্থ সং, ১৩৭২ব.

১১। ক্ষুদিরাম দাস - রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়’, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৬২

১২। ক্ষুদিরাম দাস - ‘চিত্রগীতিময়ী রবীন্দ্রবাণী’, বইপত্র, ১৯৮৪, সংশোধিত সংস্করণ

১৩। বুদ্ধদেব বসু - কবি রবীন্দ্রনাথ’, দে’জ, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৩।

একক ১১ পূরবী – সাধারন আলোচনা

বিন্যাসক্রম

১১.১ পূরবী রচনার পটভূমি

১১.২ অনুশীলনী

১১.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ ‘পূরবী’ রচনার পটভূমি

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ নানান উপলক্ষ্যে ও প্রয়োজনে বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। সমগ্র জীবনে তিনি একাদশবার বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন এবং এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের উল্লেখযোগ্য দেশে বিশ্বকবি হিসেবে সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন। ‘পূরবী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনার পটভূমিতে ছিলো চিরচঞ্চল, গতিশীল ও ‘সুদূরের পিয়াসী’ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার আমন্ত্রণ ও বিশ্ববোধ। প্রাত্যহিক প্রথানুগ জীবনের ক্লান্তিকর স্থিরাবস্থা যখনই তার কবি-আত্মাকে পীড়িত করতে, তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন স্থান পরিবর্তনের জন্য। তিনি বেরিয়ে পড়তেন পথে-প্রান্তরে, দেশে-দেশান্তরে, পাহাড়ে-সমুদ্রে, বিশ্বভুবনের ঘাটে-ঘাটে, বিশ্বপ্রকৃতির অনিঃশেষ সৌন্দর্যলোকে। মানসিক স্থবিরত্ব কবিকে কখনোই বাঁধা ঘাটে আটকে রাখেনি, মুক্তি খুঁজেছে নিখিল মানবলোকে। সেই আবেগেই একদিন বলেছিলেন—

“দেশে দেশে মোর ঘর আছে।
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে লব আমি বুঝিয়া।”

সমগ্র বিশ্বমানবতার অন্তঃপুরে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের বিশ্বপথিক বিশ্বকবি। কেবল মানুষের মধ্যে নয়, অনন্ত নিসর্গলোকে ভেসে বেড়ানোর উচ্ছ্বসিত আবেগ তাকে সংকীর্ণ কুটির প্রাঙ্গণ থেকে বাইরের বহুধা-প্রসারিত জীবন-আকাঙক্ষায় উদ্বেল করেছিলো—

"নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
উর্ধ্ব নীলাকাশে।

থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
আম্রবনাচ্ছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।"

-'দুরন্ত আশা' (মানসী)

এই উন্মাদনা, এই মাদকতা, দেশ-দেশান্তর ব্যাপ্ত করবার দুর্নিবার আশা কবিজীবন বোধনকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাতসংগীত) কবিতায় তার উদঘোষণ—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া

আকুল পাগল পারা।"

অহং-এর সীমানা ছাড়িয়ে আত্মমুক্তির নিরন্তর কল্পনায় ভেসে চলার, ব্যক্তি-জীবনে বিশ্ব-জীবনকে বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধির প্রেরণা কবির অসংখ্য কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, আভাষণে বহুবার উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। 'পূরবী'-পর্বের রবীন্দ্রমানসে ক্ষণে ক্ষণে সেই ভাবনার ছায়া কবির আবাল্য-পোষিত ভবঘুরে মনটিকে যেন নবরূপে হাজির করে।

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের পটভূমিতে আছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের সরকার রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেশে আতিথ্য গ্রহণের আবেদন জানালে তিনি তাতে সম্মতি দান করেন। যাত্রার তোড়জোড় ও মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। পেরু-সরকার চেয়েছিলেন, গুরুদেব তাঁদের দেশের স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ-উদযাপন উৎসবের বিশেষ স্মরণীয় দিনটিতে জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণ দান করুন। নতুন দেশ দেখা ও সে দেশের মানুষকে চেনা জানার এমন অপূর্ব সুযোগকে কবি হাতছাড়া করলেন না। কেননা, আগেই বলেছি কবিমানসের যে ইচ্ছার কথা, সেইটেই তাকে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার অভিমুখী করতে চাইলো। পেরু যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতনে একটি ভাষণে কবি যে কথা বলেছিলেন তাতে তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা চিরপথিক তথা বিশ্বপথিক সত্তাটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। -

"মানুষ ঘরছাড়া জীব, মানুষ পথিক।.... সে যে চিরপথিক।... যে-জাতির চলার পাথেয় ফুরোল, চলার সাধনায় যার জড়ত্ব এল, সে-জাতি তার গতির শেষে দুর্গতিতে এসে ঠেকল। ভয়ে-ভয়ে সে-জাতি তার সঞ্চয়ের খোঁটায় নিজেকে বাঁধলে-সেই বন্ধনে তার বিনাশ।" কবির এই ভাষণ তার নিরন্তর চলা-ফেরা ও দেশ দেখবার ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি।

যাইহোক ১৯শে সেপ্টেম্বর যাত্রার দিন স্থির হ'ল। কবির বয়স তখন ৬৩ বৎসর। অসুস্থ কবি, সবে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছেন। দেহ দুর্বল, মনও অশান্ত। এরকম অবস্থাতেই কবি সমুদ্রপথে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ থেকে সিংহলের কলম্বো হয়ে ইউরোপগামী জাহাজ ধরবেন, স্থির হ'ল। কবির সঙ্গী হলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও তাদের তিন বছরের পালিতা কন্যা নন্দিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রানুরাগী শান্তিনিকেতনের মালয়ালী যুবক বিজয় বাসু। পরে ফ্রান্সে কবি-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় কবির প্রস্তাবিত সফরসঙ্গী এলমহার্স্ট। কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে তার জীবনী-সংগ্রাহক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনার কিছুটা অংশ এখানে উল্লেখ করা যাক -

"দক্ষিণ আমেরিকায় কবির গন্তব্যস্থান পেরু। পেরু যাইবার কথা হইলে, কবির ইচ্ছা হইয়াছিল য়ুরোপ হইতে কিউবা হাভানা হইয়া পানামা খালের মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িবেন ও কলোয়া বন্দরে নামিয়া আন্দিজ পর্বতমালা পার হইয়া রাজধানী লিমায় পৌঁছিবেন। কিন্তু এ পথ নানা অসুবিধার জন্য পরিত্যক্ত হয়। কবির কল্পনাবিলাসী মন একবার রাশিয়া হইতে প্যান-সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়া ভ্রমণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে গোরুর গাড়ি করিয়া গ্রাট্রাংক রোড (শেরশাহ-সড়ক) ধরিয়া উত্তরভারত ভ্রমণের ইচ্ছা এখানে স্মরণীয়।" (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ৩য় সং, পৃষ্ঠা-২০৯)।

ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকার অ্যাংলো-স্যাক্সন ও নর্ডিক জাতির দেশে ঘুরেছেন কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোনো লাতিন জাতির দেশ তখনো পর্যন্ত তার দেখা হয়নি। তাছাড়া স্পেনিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় নিবিড় হয়নি। সুবিশাল দক্ষিণ আমেরিকা এশিয়াবাসীর কাছে প্রায় অজানা বললেই চলে। নতুন মানুষ ও নতুন দেশ দেখার জন্য কবির অদম্য কৌতূহল। তাই তিনি সাদরে পেরুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এবার প্রভাতকুমারের বর্ণনা তুলে ধরা যাক—

“কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের পথে কলম্বো গিয়া য়ুরোপগামী জাহাজ ধরিতে হইবে। পথের ঘটনা বিশেষ কিছু নাই এক অভ্যর্থনার উপদ্রব ছাড়া। কবির সহযাত্রী সুরেন্দ্রনাথ কর লিখিতেছেন, “দিনরাত্রি-যখনই হোক বড়ো স্টেশন এলেই লোকের ভিড় এসে গুরুদেবকে ফুল মালা খাদ্য উপহার দিয়েছে; শেষটা বড়ো অসহ্য হয়ে উঠেছিল; সব জানালা বন্ধ করে দিতাম যে রাত্রে আর কেউ জ্বালাবে না; কিন্তু গভীর রাত্রি হোক আর শেষ রাত্রিই হোক, ঠিক লোকেরা এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে গুরুদেবকে উঠিয়ে মালা, খাবার দিয়ে তবে ছাড়ত; মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে দেখি ঘরের ভিতর যত পাবে লোক ঢুকেছে। গুরুদেব দাঁড়িয়ে অকূল পাথারে ভাসছেন গাড়ি না ছাড়লে নিস্তার পেতেন না।”

এবার শরীর খুব খারাপ লইয়া কবি বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে লিখিতেছেন, “ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙ্গেছিড়ে বেঁকেচুরে গিয়েছিল ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলাম।” (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, পৃষ্ঠা-২১০) এরপর জীবনী সংকলক প্রভাতকুমারের মন্তব্য-

“কিন্তু এই অবসন্ন দেহে কাব্যলক্ষ্মীর যে অনুগ্রহলাভ করিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে; সে হইতেছে কাব্যে ‘পূরবী’ ও গদ্যে ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’ (যাত্রা)।” (সূত্র পূর্ববৎ, পৃষ্ঠা-২১০)

সঙ্গী-সাথীসহ কবি কলম্বো থেকে ইউরোপগামী জাপানী জাহাজ ‘হারুনা মারু’তে উঠলেন ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪। কবির এ সময়কার মনোভাবটি ধরা পড়েছে এইভাবে -

“অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয়নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে।... তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে কিছু দুরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে।”

যাইহোক পেরু যাত্রার চার মাস পরে মাঘ মাসের গোড়ার দিকে কবি ইতালি হয়ে দেশে ফিরে আসেন (৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১)। ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ থেকে ২৪শে জানুয়ারী ১৯২৫— এই চার মাস কবি দেশের বাইরে ছিলেন। এরমধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটে আর্জেন্টিনায়, পক্ষকাল ইতালিতে। পূরবীর বেশির ভাগ কবিতা এই চার মাসের অন্তর্বর্তীকালের রচনা। বলাবাহুল্য, কবির পক্ষে শেষমেষ পেরুতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি, কেন-না যাবার পথেই হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রযাত্রার ধকল সইতে না পারার জন্যেই তার এই অসুস্থতা। ডাক্তারের পরামর্শে কিছুকালের জন্য আর্জেন্টিনার অদূরে সান ইসিদোর (San Isidore) নামক একটি রম্য বাগানবাড়িতে কবির বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নাম্মী এক বিদূষী সেবাপরায়ণা রমণীর উপর কবির পরিচর্যার ভার অর্পণ করা হয়। ওকাম্পোর পুরো নাম সিগনোর ভিক্টোরিয়া দ্য এসত্রেদা (Signore Victoria de Estrada)। স্নেহময়ী ও সেবাব্রতী এই তরুণীর পরিচর্যায় কবি অচিরকালেই দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পান। সেবা ও পরিচর্যাসূত্রে ভিনদেশের এই তরুণীটির সঙ্গে তার স্নেহমিশ্রিত সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি তাকে স্নেহভরে 'বিজয়া'- এই মিষ্টি ভারতীয় নাম উপহার দেন। তাকে তিনি নিজের দেওয়া নামেই ডাকতেন। দেশে ফিরে 'পূরবী' কাব্য গ্রন্থটি তার নামেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন 'বিজয়ার করকমলে'। [আজেন্টিনায় কবির স্থিতিকালের রোজনামচা ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক' (বিশ্বভারতী, ৩য় সং-১৩৯৭, পৃ.-২১৯-২২৮) এবং 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' (১ম সং) শঙ্খ ঘোষ]।

'পূরবী' কাব্য মূলত দুটি পর্বে বিভাজিত ও সম্পূর্ণ। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'পূরবী'। 'পূরবী' নামকবিতা থেকে বকুল বনের পাখি পর্যন্ত একগুচ্ছ কবিতা এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'পথিক'। এই পর্বে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে (১৩৩১)। গোড়ার দিকে পূরবী-প্রসঙ্গে 'সঞ্চিতা' নামে তৃতীয় একটি পর্বের কথা কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু সঞ্চিতা পর্বের কবিতাবলীতে পূরবী কাব্যের মূল ভাব ও সুর অনুপস্থিত থাকায় পরবর্তী পরিমার্জিত

সংস্করণে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হয়। তাই 'পূরবী' ও 'পথিক' পর্বের কবিতাগুলি নিয়েই বর্তমানের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, পূরবীতে এমন কিছু সংখ্যক কবিতা আছে যেগুলির রচনাকাল পূরবী গ্রন্থ পরিকল্পনার আগে অথবা পরে। যেমন 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'শেষগান' কবিতাটি। এই কবিতাটিই আবার 'পূরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম কবিতার (প্রথম কবিতা) সম্মান পেয়েছে 'পূরবী' নামে। এই নামটিই কবির কাছে গ্রন্থের ভাব ও অর্থদ্যোতনা প্রকাশের উপযোগী মনে হওয়ায় তিনি কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই গ্রন্থের শিরোনাম দেন 'পূরবী'। বর্তমান কাব্যে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এহো বাহ্য।

রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রেই জানেন যে বিশ্বকাব্যকুঞ্জের মধুকর রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা কুসুম চয়ন করেছিলেন তা দিয়ে রচিত হয়েছিলো তাঁর কাব্য-মালঞ্চ। বস্তুত কবি-রত্নাকর রবীন্দ্রনাথ যেন বিচিত্রচারী নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা। তাঁর প্রতিটি কাব্যকুসুম আপন বর্ণে সৌন্দর্যে সৌরভে সেই মালার ঐশ্বর্য ও গৌরব বর্ধন করেছে। কবি জীবনের উন্মেষ পর্ব থেকে সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারায় যে পরিণতির দিকে এগিয়েছিলেন, তাতে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ ও তার কবিতাবলী স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল-সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থকে এক একটি পুষ্পের প্রতীকরূপে গ্রহণ করলে সেগুলি দিয়ে যে অপূর্বসৃষ্ট সুন্দর মালাখানি তিনি রচনা করেছিলেন তাতে ভাব-ভাষা-রসবোধ ও উপলব্ধির নিবিড় রসঘন রূপ রবীন্দ্র কবিতাকে অমরত্ব দান করেছে।

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে কয়েকটি বিশেষ ভাব-তত্ত্ব নীতি ও আদর্শ বানীরূপ লাভ করেছে। গীতিরস, চিত্রধর্মিতা, মর্ত্যমমতা, প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণবোধ । জীবনদেবতা তত্ত্ব, গতির দর্শন, মৃত্যুচেতনা, জন্ম-মৃত্যুর নিবিড় ঐক্য প্রভৃতি রাবীন্দ্রিক অনুভূতির অভিব্যক্তি তার সকল কাব্যে কোনো-না-কোনোভাবে শিল্প হয়েছে। ফলে কেবল কাব্যে বা গানে নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয় বিভিন্নভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। এক একটি ভাব কোনো বিশেষ একটি কাব্যে শেষ হয়ে যেন শেষ হয় না, পরবর্তী কাব্যধারার মধ্যেও তার রেশটুকু বর্তমান থাকে। এমনি করে পূর্বাপর কাব্যের ঐতিহ্য

পরম্পরার মধ্য দিয়ে গতিশীল হয় কবিচেতনা। তাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের যে-কোনো একটি পর্বে-রচিত কাব্যকে কখনোই বিক্ষিপ্ত, সংযোগসূত্রহীন কিম্বা আকস্মিক বলা চলে না। তারা যেন একই রবীন্দ্রনাথের, ক্রমিক ভাব ও মানস পরিক্রমার সুষম প্রকাশ। আত্মপ্রকাশের দুর্মর আকাঙ্খায় আপন অনুভূতিকে সমগ্রতা দানের প্রয়াস যে এত গভীর, এত নিবিড়, এত সুদুর ও পরিণতি-সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের মতো জগতের খুব কম প্রতিভার মধ্যেই তা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে তিনি শেলী, কীটস্ গ্যেটে, হুইটম্যান প্রভৃতি বিশ্ব দার্শনিকদেরও সহজেই অতিক্রম করে যান। সংকোচনশীল নয়, সম্প্রসারণশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা।

'পূরবী'র প্রকাশকাল ১৯২৫। তার আগে রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাদের প্রকাশ রূপের অন্তর্নিহিত ভাব ও সুরের রেশ ঐতিহ্যসূত্রে 'পূরবী'র সঙ্গে মিশেছে। কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২)। কবির বিশেষত্ব এই যে এক একটি কাব্য রচনার মুহূর্তে তিনি আদ্যন্ত একই ভাব ও সুরের বলয়ে অবস্থান করতেন। সেই ভাব-সুরের বিচিত্র প্রকাশরূপ লক্ষ্য করেই কবিচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ হোতো। ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত কবিতাগুলির মধ্যে কবি যে সকল ভাবকে বাণীমূর্তি দান করেছিলেন সেগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বলাকা'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তারুণ্যের বন্দনা (দ্রঃ বলাকা' ১ ও ৪৪ সংখ্যক কবিতা), গতিতত্ত্ব বা গতিবাদ অথবা গতির দর্শন (দ্রঃ 'বলাকা'র ৩, ৩৬ সংখ্যক কবিতা), আনন্দ-বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা (নষ্টালজিয়া প্রেমের অবিনশ্বরত্ব (দ্রঃ বলাকা-৭ ও ৩২ সংখ্যক কবিতা), মৃত্যুচেতনা (দ্রঃ বলাকা-৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা) ও ছন্দোনিরীক্ষা (মুক্তবন্ধ ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা)। 'পলাতকা'র মূল আকর্ষণ অসম পদ্যছন্দে গল্পরসসৃষ্টি ও বিশিষ্ট দার্শনিক উপলব্ধি জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও চিরপলাতক। জগতের কোনো কিছুকেই যেন চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির নিবিড় আকর্ষনের বিষয়টিও 'পলাতকা'র গল্পরসসিক্ত কবিতাগুলির অন্যতর বিশিষ্টতা যার পরিণতি সমাজ সমালোচনা (দ্রঃ 'নিষ্কৃতি' কবিতা) ও জন্ম-মৃত্যুর সরণি বেয়ে শূন্যতা থেকে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার উপলব্ধিতে-

"আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ।

যে সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ব্যক্তিমানবের অন্তরে লুকিয়ে থাকে চিরন্তন এক শিশু। জীবনের খরদুঃখ তাপের মাঝখানে এই শিশুটি আছে বলেই মানুষ সকল ব্যর্থতা, যাতনা, বঞ্চনা প্রভৃতি দুঃসময়ের দুর্দৈবগুলিকে সহজে আত্মস্থ ও অতিক্রম করতে পারে। মানবজীবনে এই চিরন্তন শিশু ভোলানাথকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখেছিলেন—

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।.... প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি... আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটুলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" ভোলানাথ শিব যেমন চিরনতুন সৃষ্টির খেলায় মগ্ন, ধ্বংসের মধ্যেই তার সৃষ্টির লীলা, তেমনি আমাদের শিশু ভোলানাথটিও খেলা ভাঙ্গার খেলায় আনন্দে মাতোয়ারা। আত্মভোলা মহেশ্বর আর আপনভোলা নির্মল শিশু স্বরূপধর্মে এক। তাদের মধ্যে এই নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্রটি কবি আপন অন্তরে অনুভব করে লিখেছিলেন—

'সৃষ্টির মূলে এই লীলা— নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি, তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার জবাবদিহি নেই।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি) শিশুর উদ্দেশ্যহীন খেলা, ভাঙ্গা-গড়া, চলা-ফেরা সব কিছুতেই আনন্দ, আনন্দ নতুন সৃষ্টিতে। "পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির লীলায় শূন্য আকাশকে পূর্ণ করেন, শিশুও তেমনি পথকে মুক্তির আনন্দে পূর্ণ করে। অহেতুক লীলায় শিশু ভোলানাথের সঙ্গে মহেশ্বরের যোগ আছে।" (রবিরশ্মি-পশ্চিমভাগ ১ম সং. পৃ. ২৩১- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 'পূরবী'

পর্বের অনেক কবিতাতে কবি পূর্বসৃষ্ট শিশু ভোলানাথের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। পদধ্বনি, 'পথ' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রসঙ্গত স্মরণ্য।

'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'—দুটি গ্রন্থের একটি অপরটির পরিপূরক। কবি এই দুই কাব্যে অন্তরের চির শিশুটিকে কৌতুকে, মাধুর্যে-সৌন্দর্যরসে পূর্ণ করে দেখেছেন। 'পূরবী'র কবিতাতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবির অভিব্যক্তি -

"শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে যে জানে ছুটি বলে ।
ঘর ছেড়ে আসি তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যক নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।"

(পথ— পূরবী)

১১.২ অনুশীলনী

১। পূরবী কাব্যগ্রন্থ রচনার পটভূমি আলোচনা করো।

১১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র বিশ্বভারতী সং)।

৩। যাত্রী (বিশ্বভারতী সং)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্বভারতী)– প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং)- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং)- প্রমথনাথ বিশী।

৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ)— প্রমথনাথ বিশী।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং)- শঙ্খ ঘোষ।

১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীসম্পাদিত ১ম সং)।

একক ১২ কবিতা বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

১২.১ পূরবী

১২.২ মাটির ডাক

১২.৩ পঁচিশে বৈশাখ

১২.৪ তপভঙ্গ

১২.৫ আগমনী

১২.৬ অনুশীলনী

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ পূরবী

‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা ‘পূরবী'। আগেই উল্লেখ করেছি, ‘পূরবী’ গ্রন্থ পরিকল্পনার অনেক আগেই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো। কবিতাটির শিরোনাম ছিলো ‘শেষ গান’। অন্য এক কাব্যের বিশেষ একটি কবিতা ভিন্ন শিরোনামে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা হয়ে ওঠার নজির রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে সুলভ হলেও (যেমন— যক্ষপুরী’ থেকে ‘রক্তকরবী’, ‘রাজা’ থেকে ‘অরূপরতন’ প্রভৃতি) কাব্যের ক্ষেত্রে বিরল। একটি কবিতা একটি কাব্যের শিরোনাম হতে বাধা নেই। কিন্তু ‘শেষ গান’ থেকে ‘পূরবী’ এবং কাব্যেরও শিরোনাম হয়ে ওঠা একটু আশ্চর্যের বই কি! নাটক কিম্বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শিরোনাম পরিবর্তন ও রূপান্তরণের পেছনে যে সকল কারণ থাকে (যেমন— গণচাহিদা, সংক্ষিপ্তকরণ, আদর্শায়ন, ব্যঞ্জনাধর্মিতা প্রভৃতি) সেগুলির অনেকাংশই এখানে অনুপস্থিত। কেননা ‘শেষ গান’ (পলাতকা)— এই পুরো কবিতাটি

আদ্যন্ত কোনো পরিবর্তন না করে ‘পূরবী’ নামে পূরবী কাব্যগ্রন্থে হুবহু উদ্ধৃত হলো— এ বিস্ময়কর !

তবে বিস্ময়কর হলেও কারণটা অনুমান করতে বাধা নেই। মনে হয়, পূরবী’র কবিতাগুলি রচনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কবির মনে ভাবপ্লাবন ও সাময়িক ভাবদৈন্যের যে নৈরাশ্য-পীড়িত দ্বন্দ্ব আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, ‘পলাতকা’ থেকেই তার সূচনা এবং তার পরিণতি ‘শেষ গান’ কবিতায়। সুতরাং, কবিতাটির ভাব ও ব্যঞ্জনার সাধ্য লক্ষ্য করেই বোধকরি কবি ‘শেষগান’-কে আরও ব্যঞ্জনাধর্মী করে ‘পূরবী’তে উত্তীর্ণ করে দিতে কোনো দ্বিধা বা সংশয় পোষণ করেন নি।

যাইহোক বর্তমান কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অবশ্যই পূরবী-রচনার পটভূমি-কেন্দ্রিত অধ্যায়টি স্মরণে রেখে অগ্রসর হতে হবে। যাট-উত্তীর্ণ কবিমনের টানাপোড়েনের দোলায় ভাবাবেগের স্রোত মাঝে মাঝে মন্দগামিনী হয়েছে। জোয়ার শেষে ভাটার টানে দুকূল প্লাবিনী স্রোতোধারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষীণ তোয়ায় পরিণত হয়, বালির চড়া ক্ষীণ জলধারাকে যেমন গ্রাস করে ফেলে, তেমনিভাবে জীর্ণ, জরাক্লিষ্ট নৈরাশ্যপীড়িত কবিও জীবন-পরিক্রমায় স্বাভাবিক চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেন। মাঝে মাঝে কবির মনে হয়, কাব্যরসের সঞ্চিত অফুরন্ত উৎস ধারা বুঝি ভাটার টানে শুকিয়ে যাওয়া মরা নদীতে পরিণত হতে চলেছে। কবিজীবনের এই মন্দাভাব কাব্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। ক্ষণিকের সংশয়, ক্লান্তি, বেদনা ও বিষন্নতার হাত থেকে কীভাবে আত্মশক্তির প্রবল বিশ্বাসে বার্ধক্যের মরুপ্রান্তরে নতুন প্রাণাবেগের বন্যায় মরুদ্যান সৃষ্টি করে আত্মমুক্তির আনন্দে মেতে উঠলেন, অগণিত ভক্ত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে জাগ্রত ও নন্দিত করলেন, তারই উজ্জ্বল অভিজ্ঞান পূরবীর ‘পূরবী’ ও পথিক-পর্বের কবিতাগুলি। ‘পলাতকা’ ও ‘শিশু ভোলানাথ’ পর্বের সংশয় চিরতরে অস্তমিত হ’ল পূরবীর উজ্জীবন আশ্বাসে।

পূরবী সায়ংকালে গেয় রাগবিশেষ, মতান্তরে দিনশেষের গোধূলির রাগ। অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মিলেখায় পূর্বদিগন্ত তখনও রক্তিমাভ, সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ছায়া বিস্তার করছে। এমন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র খেলায় মানুষের মন যেন একপ্রকার বেদনার,

বিষণ্ণতার মূছনায় আপ্লুত হয়। ফেলে আসা দিনস্মৃতির তর্পণ আনন্দ-বেদনামেদুরতার আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করে। তেমনই স্মৃতিচারণার ছবি ও গান 'পূরবী' কবিতাটিকে কবি-আত্মার সমীক্ষণে ভাস্বর করে তুলেছে।

জীবন-পরিক্রমার এক বিশেষ লগ্নে পৌছে আত্মসমীক্ষামগ্ন কবি যখন জীবনের আশা নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব কষতে বসেন, তখন মনে হয়, তার ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ থেকে কবি রবীন্দ্রনাথে উত্তরণের সঙ্গে অঙ্গরাগের মতো অনুলিপ্ত হয়ে আছেন তার অগণিত ভালোবাসার জন— আত্মীয়-স্বজন-পরিজন যাঁরা স্নেহ-মমতা-প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে তার অন্তরকে ভরিয়ে তুলেছিলেন। সেই সকল আপনজন— কাছের মানুষ কবিচেতনার বিকাশে প্রেরণাশক্তিরূপে যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সেই দানকে আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বারম্বার স্মরণ করেছেন -

"যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝর্না নিল তুলি;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়ু।"

কবির সেই 'আপন মানুষগুলি' জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে তাকে আনন্দরসের জগতে – কবিমানসে পৌঁছে দিয়েছিলেন বলেই তিনি কখনো তাদের বিস্মৃত হননি। তাদের আনন্দে কবির আনন্দ, তাঁদের দুঃখে কবির দুঃখ। তিনি বেশ অনুভব করতে পারেন, তাদের প্রতিদিনের, প্রতিনিমেষের অবদানের কথা। একটি ফুল যেমন করে প্রতিমুহূতে প্রতিদিনের রসসঞ্চয়ে ফলে পরিণত হয় তার অপরিণত দশা থেকে সুপুষ্ট রসপূর্ণ সুপথ ফলে, তেমনি কবিও তাঁর প্রিয়জনের নিত্য সাহচর্যে, ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতার দানে পাথেয় সংগ্রহ করে পূর্ণ করে তোলেন তার আনন্দরসমধুর কাব্যের

পেয়ালা। একটি উৎপ্রেক্ষায় অতীত ও বর্তমানের মিলনে জীবনে পূর্ণতার ভাবটি প্রকাশ করে কবি লিখেছেন—

"তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে ;

নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে;

অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—

গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে

বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে।"

শিশু মাতৃজঠর থেকে মুক্ত হলেও সদ্যোজাত সেই শিশুর সঙ্গে মাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হয় না। মায়ের বুকে-কোলে-বেড়ে ওঠা সেই শিশু ও তার মায়ের মিলনের সেতু নিবিড় প্রেমের বাঁধন। ঠিক তেমনি শিশু-রবীন্দ্রনাথ আর বড়ো হয়ে ওঠা কবি রবীন্দ্রনাথ এদের সংযোগ সেতুরূপে অবস্থান করেছিলেন যে সকল স্বজন-পরিজন, তাদের সবার কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে আর উতলা-উন্মনা হন কবি। না, তাঁর পরিচিত সেই আপনজনের অনেকেই আজ ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে 'সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে' হারিয়ে গেছেন। সেই বেদনা কবি-জীবনে বয়ে এনেছে রিক্ততা শূন্যতা ও বিশীর্ণতার বোধ।

কিন্তু 'রিক্তশীর্ণ জীবন'বহন করেও তিনি আত্মস্থ হওয়ার সাধনায় শক্তি সঞ্চয়ে লিপ্ত হয়েছেন। যাঁরা পরলোকে তাদের জন্য শ্রদ্ধা ও সমবেদনা উজাড় করে দিয়েও বাস্তব সত্যকে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছেন। বর্তমান ও জীবিতদের সঙ্গে নিয়েই কবি আরও একবার সকল দৈন্য, রিক্ততা, শীর্ণ-শূন্যতার মাঝখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে প্রাণৈশ্বর্যে নবজীবনের রসে সঞ্জীবিত হতে চান। জীবনরসিক, প্রকৃতিপ্রেমিক কবি সূর্য-চন্দ্র তারা, জল-হাওয়া-মাটির সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্বীকার করে শেষ বেলায় অবেলায় 'পূরবী রাগে নতুন সুরে, নবীন তানে মনোবীণার তারগুলিকে বেঁধে নিতে চান। যে রোমান্টিক আবেগে একদিন অল্পবয়সে কাব্যরসে জগৎকে প্লাবিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আরব-বেদুইনের দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে জীবনস্রোতকে আকাশে ঢেলে দেবার

স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও তিনি ফিরে পেতে চাইলেন সেই শৈশব-যৌবনের রঙ-রস উচ্ছলতা, রোমান্স-প্রেম-সৌন্দর্যাশিত জীবনমুখরতাকে। সেই স্বপ্ন, সেই দীপ্ত আবেগ অস্তাচলগামী অরুণরাগের মতো, নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মতো আর একবার ঝলসে উঠে ঝলমল করে দিয়েছে আমাদের চিত্ত -

"তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ন-বেলায়

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,-

বলে নে, ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো।

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়

ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে

পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,

তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে নতুন প্রভাতের আলোয় চিত্ত জাগরণের আশা বলে করে কবি নবজীবনানন্দের স্বাদ পেতে চাইলেন। তার এই প্রত্যাশার গানকে পরিণামী সিদ্ধান্তে তাই বিষাদ-সংগীত বলে মনে হয় না। পূরবী কবিতাটি আমার বিবেচনায় বিষণ্ণ কবি-আত্মার হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে-যাওয়ার বেদনায় স্নান কখনোই নয়, বরং তা ভস্ম অপমান-শয্যা থেকে পুষ্পধনুর নবজাগরণের মতো নব আনন্দে জেগে ওঠার, বেঁচে ওঠার গান—জীবন-সংগীত। সেই সঙ্গীতের সুষমা দীর্ঘ মিশ্রবৃত্তের সুষম ছন্দে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিও হয়ে উঠেছে ভাবরসঋদ্ধ ও প্রসাদগুণে ভরা।

১২.২ মাটির ডাক

পূরবী' কাব্যগ্রন্থের পূরবী-পর্বের উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা 'মাটির ডাক'। পেরু যাত্রার পথে অসুস্থ কবি যাত্রা স্থগিত রেখে আর্জেন্টিনার অদূরে 'San Isidore' নামক রম্য বাগানবাড়িতে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তখন তার সেবা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন Signore Victoria de Estrada বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে বিদুষী তরুণী। তাঁর সেবা ও সাহচর্যে কবি স্বল্পকালের মধ্যেই খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

স্বভাবতঃই সুদূর প্রবাসে ক্লান্ত কবিমন দেশের জন্য উতলা হতে থাকে। যে কবি পরম উৎসাহের আবেগে বলেছিলেন, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া', যিনি মনেধর্মে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শে অবিচল—সেই বিশ্বপ্রিয়, বিশ্বপ্রেমী কবির মনে স্বদেশের আলো-হাওয়া-আকাশ-জল-মাটি, সবুজ ঘাস, গাছপালা প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ নিবিড় হতে থাকে। কথায় বলে, 'দূরহুক দুর গৈলে দোগুণ পীরিতি। অর্থাৎ দূরে বহুদূরে— দেশান্তরে গেলে মানুষের মনে নিজের পরিবেশ-স্বজন পরিজনদের প্রতি আকর্ষণ বহুগুণিত হয়। কবির ক্ষেত্রেও তাই সত্য হয়ে উঠেছিলো। দীর্ঘকাল শ্যামজন্মদে বঙ্গভূমি তথা ভারতের বাইরে থাকার জন্য কবি যেন অনেকটাই স্বদেশ কাতর তথা গৃহ-কাতর {Home Sick) হয়ে পড়েছিলেন। দেহ-মনের এই রকম বিচলনের মুহূর্তে কবি ও নিজের মাতৃভূমি ও প্রকৃতিকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসেন যার কাছে অন্য যে-কোনো প্রকার স্নেহ ভালোবাসার আকর্ষণ ফিকে হয়ে যায়, তার পরিচয় যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন--

"আজকে খবর পেলেম খাঁটি

মা আমার এই শ্যামল মাটি,

অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন;"

এই আত্ম-আবিষ্কার বলা যেতে পারে আত্ম-বিস্ফারের আনন্দকে কবি কীভাবে প্রকাশরূপ দিয়েছেন 'মাটির ডাক' কবিতাটির ধারাবাহিক আলোচনায় তা স্পষ্ট হতে পারে।

কবিতাটি মোট ৪টি সংখ্যাক্রমে বিধৃত। প্রতিটি সংখ্যা এক একটি বড়ো স্তবকের সমাহার। সুতরাং 'মাটির ডাক' চারটি বড়ো স্তবকের সমন্বয়ে গঠিত একটি দীর্ঘ কবিতা। কলাবৃত্ত ছন্দের সমঞ্জস ব্যবহারে সমৃদ্ধ ভাবরসঘন একটি উজ্জ্বল-সুন্দর কবিতা এই 'মাটির ডাক'। ভারতের মহাবাণী– জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। স্বদেশই সেক্ষেত্রে ত্রিভুবন অথবা ত্রিভুবনই স্বদেশ 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম।' রবীন্দ্রনাথের এই দুটি ভারতীয় সংস্কার ও প্রবাসজীবনের গৃহ কাতরতার মিশ্র ফল এই 'মাটির ডাক' কবিতাটি।

প্রবাসে স্বদেশ ও স্বজনের স্মৃতিচারণার আনন্দে মাতোয়ারা কবি স্মরণ করেছেন প্রকৃতির অযাচিত দাক্ষিণ্য ও অন্তহীন ঋতুবৈচিত্র্যের কথা। ফাল্গুন মাসে শালবনে যেদিন খ্যাপা হাওয়ার উদ্দাম লীলায় বিপুল ব্যাকুলতার মধ্যে শুরু হয়ে যেতো মাতন, সেদিন কোন্ মন্ত্র বলে দিকে-দিগন্তরে কচি পত্রোদ্গমে অরণ্যে অরণ্যে সাড়া পড়ে যেতো। কবির মনে হোতো বসন্ত সমাগমের আহ্বানবাণী যেন তিনি অন্তরের নিভৃতে গুহায়িত হৃদয়কুঞ্জছায়ায় অনুভব করতে পারছেন। তা না হলে কিশলয়ে কিশলয়ে সাড়াজাগানো বসন্ত বাতাসে তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে কেন? আবার ফাল্গুন পেরিয়ে ঋতুপ্রকৃতিতে যেদিন শরতের আবির্ভাব ঘটতো, সূর্যোদয়ের রাঙা আলোয় নদীতীরের ফসল-খেতে কচি ধানের খাম খেয়ালি খেলায় নীল আকাশের কূলে কূলে' যেন সবুজ সাগর দুলে উঠতো— সবুজের ঢেউ খেলে যেতো, কবি অনুভব করতেন ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অভিন্ন আত্মীয়তা। তা না হলে শরতে সবুজের এই সমারোহে অবগাহনের জন্য তার মন উতলা হবে কেন? আত্মবিস্মৃতির অতল থেকে মুক্তির জন্য তাই কি কবিপ্রাণ প্রকৃতির যজ্ঞশালায় আশ্রয়প্রার্থী? -

"সেদিন আমার হ'ত মনে

ওই সবুজের নিমন্ত্রণে

যেন আমার প্রাণের আছে দাবি;

তাই তো হিয়া ছুটে পালায়।

যেতে তারি যজ্ঞশালায়,

কোন্ ভুলে যায় হারিয়েছিল চাবি।" (১ম স্তবক)

জননী ও জন্মভূমির প্রতি কবির নাড়ির টান। আকাশে-বাতাসে দিবারাত্র যেন তাদের আহ্বান তার অন্তরে নাড়া দেয়। যে জননীর কোলে তার মর্তজীবনে আবির্ভাব, সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে দূরে থাকার বেদনায় তার হৃদয় ভরে থাকে। তার মনে হয়, কেউ যেন জোর করে তাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে নানান পাকে জড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনায় লীন তার অন্তরাত্মা মা ও ছেলের এই ছাড়াছাড়ি সইবে না, সইতে পারে না, উল্টে বরঞ্চ, শুরু হবে তার প্রতিক্রিয়া এবং সে অবশ্যই ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে। মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণের বাোধ কবির মগ্নচেতনায় একপ্রকার অকারণ বেদনা ও শূন্যতাজাত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছে। সেই ব্যাকুলতা শূন্যহৃদয় কবিকে করে তুলেছে অস্থির চঞ্চল, করে তুলেছে মাতৃস্নেহবিলাসী -

"শুনে আমি ভাবি মনে,

তাই ব্যথা এই অকারণে,

প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,

তাই বাজে কার করুণ সুরে

'গেছিস দূরে, অনের দূরে'

কী যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।

তাই এতদিন সকলখানে

কিসের অভাব জাগে প্রাণে।

ভালো করে পাইনি তাহা বুঝে;

ফিরেছি তাই নানামতে।

নানান হাটে, নানান পথে।

হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।”

(২য় স্তবক)

মাতৃকোলের এই পিপাসা কবিকে গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে জীবধাত্রী মাটি-মাকে অভিন্ন করে দেখতে শিখিয়েছে, তার জীবনদায়ী ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করেছে। কবিচিত্তে হয়েছে পরম সত্যের উদ্বোধন-

“আজকে খবর পেলেম খাঁটি

মা আমার এই শ্যামল মাটি,

অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন;

অভ্রভেদী মন্দিরে তার

বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,

ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।

এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে

প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে;

আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,

এইখানে সে পূজার কালে।

সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে ।

শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।”

দূর প্রবাসে কবির মনে যখনই দেশের স্মৃতি, মাটি-মার স্মৃতি জাগ্রত হয়, উদ্বেল হয়। তার অন্তর। জননী বসুন্ধরার স্নেহনিবিড় সান্নিধ্য থেকে অর্থোপার্জনের নেশায় দূরে চলে

গিয়ে সম্পদের সাশ্রয় হয়তো হয়, কিন্তু ধনের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরার মাঝখানে সৃষ্টি হয় এক বিরাট শূন্যতার। ফলে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহারা কবি কবিসৃষ্টির, ধ্রুবপথ বিস্মৃত হন। তাই কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে। (স্তবক-৩) তৎসত্ত্বেও অলোকসামান্য সৃজনীশক্তির অধিকারী, কল্পনাবিলাসী কবি দেশপ্রকৃতি ও দেশজননীর প্রতি যে নিবিড় মানস-নৈকট্য অনুভব করেন তাতেই ছুটে যায় সকল প্রতিবন্ধকতার কৃত্রিম মানস-শৃঙ্খল। মুক্তিসুখের উল্লাসে, ধরিত্রী মার পাত পেড়ে অন্ন-বিতরণে, ঋতুবৈচিত্র্যে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন 'বিশ্বজনের প্রাণ'কে স্পর্শ করেন। দূর ও নিকটের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে উদাসীন কবিপ্রাণ পূর্ণ হয় পরম প্রাপ্তির আনন্দে -

"কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট তাহা—
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চার দিকে এই যে ঘর আছে।
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।"

আসলে দূর নিকট বলে কিছুই নেই। 'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?' এই মহান বিশ্ববোধের সঙ্গে ভালওবাসা ও শ্রদ্ধার সহযোগ ঘটলে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে বাস করেও স্বদেশের প্রিয়তম মাতৃভূমির প্রতি গভীর টান অনুভব করা সম্ভব। আপন পর, কাছে-দূরে-কেন্দ্রিত ধারণা মানসিক বোধের ভ্রান্তিময় দুর্বলতারই প্রকাশ যাকে পরম প্রীতি, পরম আত্মীয়তায় সহজেই অতিক্রম করা যায় এমন একটা অনুভবের প্রতিফলন ঘটেছে 'মাটির ডাক' কবিতায়। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র যাইহোক না, জননী ও জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা কোনো দিন মন থেকে, স্মৃতি থেকে মুছে যায় না, মরে না— এই বোধটিও কবিতাটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

১২.৩ পঁচিশে বৈশাখ

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে, ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। নিজের আবির্ভাব দিনটিকে স্মরণ করে কবি অন্ততঃ দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তার একটি 'পূরবী'র 'পঁচিশে বৈশাখ', এবং দ্বিতীয়টি আরও চোদ্দ বছর পরে লেখা 'সেঁজুতি' কাব্যের 'জন্মদিন' (১৯৩৮)। দুটি কবিতার ভাবধর্ম এক হলেও উপস্থাপন ও প্রকাশশৈলীর বৈচিত্র্য কবিতা দুটিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। 'সেঁজুতি'র কবিতাগুলি 'প্রান্তিক'-পর্বের রচনা এবং সেগুলিতে প্রান্তিক কাব্যে বর্ণিত কবিভাবনার ছায়া বর্তমান যার পরিণতি যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর রণরক্তবিফলতায় পীড়িত, মানবাত্মার অপমানে ব্যথিত সন্তপ্ত কবির প্রতিবাদী সত্তার জাগরণে—

"বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে।"

(প্রান্তিক ১৮সংখ্যক কবিতা)

প্রান্তিকের এই আবহ 'সেঁজুতি'র 'জন্মদিন' কবিতায় জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ছায়া বিস্তার করেছে। কিন্তু 'পূরবী'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি তার অনেক বছর আগে ভিন্ন পটভূমিতে লেখা বলে দুটি কবিতার তৌল বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রেক্ষিত যাইহোক, জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ভাবের আবেগে উদ্বেল কবির নষ্টালজিয়া দুটি কবিতাতেই অল্প-বিস্তর আবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির মূল ভাব-রসের বিশ্লেষণ আমাদের আলোচ্য।

'পঁচিশে বৈশাখ' পাঁচটি বড়ো স্তবকে সম্পূর্ণ একটি নিটোল কবিতা। জন্মদিনটির উপর মানবীয় সত্তাচেতনা আরোপ করে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কবি ঋদ্ধ করেছেন কবিতাটিকে। জন্মদিন—সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। প্রতি বছর এই বিশেষ

দিনটিতে কবির আবির্ভাবের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন দূতরূপে তার আবির্ভাব।

“রাত্রি হল ভোর।

আজি মোর

জন্মের-স্মরণ-পূর্ণ বাণী

প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি

হাতে করে আনি

দ্বারে আসি দিল ডাক।

পঁচিশে বৈশাখ।”

কবির জন্মদিনের মাহেন্দ্রক্ষণটি স্মরণের তুলিতে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পূর্ব দিগন্তে অরুণালোক উঁকি দিচ্ছে। সেই আলো পড়েছে গাছের মাথায়, পত্র-পল্লবের উপরে, আর তাদের ম্লান ছায়া পড়েছে নীচে। সমগ্র বনভূমিকে স্নান করিয়ে দিয়েছে সেই ছায়া। মনে হচ্ছে যেন চারদিকে ছড়িয়েছে বিষন্ন ভৈরবীর করুণ মূর্ছনা। ধীরে ধীরে সেই আলো শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মর ধ্বনি জাগরিত করে বনান্তের ধ্যান ভেঙ্গে দিলো। এ যেন রিক্ত সন্ন্যাসীর উদার ললাটে আঁকা তিলকরেখার মতোই বিকশিত প্রথম অরুণ-কিরণ। পঁচিশে বৈশাখের এমনি এক সূর্যালোকিত দিনে শিশু রবির আবির্ভাব। এই বিশেষ দিনটি ফিবছর নতুন বেশে, নতুন বৈচিত্র্যে, নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ফিরে আসে কবির কাছে। সেই প্রিয় দিনটিকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রকৃতিলোকে সাড়া পড়ে যায়। জেগে ওঠে আতা আমের বন, শিহরিত হয় তরুণ তালের গুচ্ছ, কালবৈশাখীর মত্ত মেঘের বন্ধনহীন বেগে উড়ে যায় শুকনো পাতা। কিন্তু কালবৈশাখীর উন্মত্ত ঝড়ো হাওয়ায় যার চঞ্চলতা, সেই দিনটিই আবার কবির কাছে ধরা দেয় একান্তে, নিভৃতে, নীলকান্ত আকাশের উপরে উচ্ছলিত সুধার পেয়ালার মতো আনন্দরসে পূর্ণ পৃথিবীর এক প্রৌঢ় মানবশিশুর কাছে। উদিত সূর্যের রঙে উজ্জ্বল হলুদ

বর্ণের উত্তরীয় দিয়ে ঢাকা প্রাণদেবতার নিজের হাতে পাঠানো সুসজ্জিত উপহারের ডালি নিয়ে তার আবির্ভাব -

"আর সে একান্ত আসে।

মোর পাশে

পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার

স্বহস্তে-সজ্জিত উপহার—

নীলকান্ত আকাশের থালা

তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।" (১ম স্তবক)

আজ সকালে সেই শুভ দিনটি যেন অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খনাদ ধ্বনিত করে ফিরে এসেছে কবির কাছে। তার নির্ঘোষ তিনি যেন ঘনঘন শুনতে পান আপন হৃদয়ের মধ্যে। জন্ম মৃত্যুর যে দিগ্বিলয়-চক্ররেখা জীবনকে ঘেরাটোপে আটক রেখেছিলো, নিমেষে তা অদৃশ্য হয়, আর সেই শূন্যতা মহাকালের বাঁশরীর তানে শুভ্র আলোর মালায় ঢাকা পড়ে। সেই আলো, অন্তহীন সংগীতের সেই মূর্ছনা আলোকিত করে তার হৃদয়কে। প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে, চিত্তে তারই ঝংকার, সুরবৈচিত্র্যে তারই অনুরণন ও অনুভব। (২য় স্তবক)

জন্মদিনের মঙ্গলদূত পূর্বদিগন্তের নীচে পৃথিবীতে নেমে এসে শান্ত হাসিতে ভরিয়ে দেন। কবির অন্তর, কানে কানে জন্মদিনের গূঢ়ার্থ প্রকাশিত করে নবজীবনের, নবজাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে দিয়ে উদ্বোধিত করেন তাঁকে

"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে

এক দিন তুমি এসেছিলে

এ নিখিলে

নবমল্লিকার গন্ধে

সপ্তপর্ণপল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে

শ্যামলের বুকে,

নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন সম্মুখে।

সেই-যে নূতন তুমি,

তোমারে ললাট চুমি

এসেছি জাগাতে

বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।"(৩য় স্তবক)

জন্মদিনের অর্থ আরও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তিনি বলেছিলেন, জন্মের প্রথম শুভক্ষণটি আবার নতুন হয়ে ধরা দিক কবির কাছে। তাঁর কবিচেতনাকে আড়াল করেছে 'শীর্ণ নিমেষের যতো ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি'— সে সকল নিঃশেষে দূরে সরে যাক নবজাগ্রত প্রভাতে। নবীন কবি যেন প্রথম জন্মদিনটিকে অক্ষয় করে তুলতে পারেন প্রতি পলে জেগে ওঠা ঝর্ণাধারার মতো, প্রতিক্ষণে উছলে ওঠা সমুদ্র তরঙ্গের মতো। ভস্ম থেকে দীপ্ত হুতাসনের মতো সকল জীর্ণতার, সকল মালিন্যের, সকল বাধার আবরণ ভেদ করে, নবোদিত সূর্যের তেজ ধারণ করে তার নবজাগরণ পূর্ণ হোক—

"হে নূতন,

হোক তব জাগরণ,

ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাসন।" (৪র্থ স্তবক)

নবজাগরণের নতুন দিনে কুজ্ঝটিকা উদ্ঘাটিত করে সূর্যপ্রভাস্বর রবিকবির প্রকাশ হোক। বসন্তের আবির্ভাবে সমগ্র বনভূমির বৃক্ষশাখাগুলি যেমন মুহূর্তে কিশলয়ে ভরে ওঠে, তেমনিভাবে সল রিক্ততাকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে তুলুন কবি। জন্মদিনের নতুন আলোয় জীবনের জয় ঘোষিত হোক, তার মধ্যে প্রকাশিত হোক অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।

"ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,

ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয় দিগন্তে শুভ্র শঙ্খধ্বনির মধ্যে কবি আপন চিত্তের মাঝে শুনতে পেলেন পঁচিশে বৈশাখের পদধ্বনি, শুনতে পেলেন তার চিরনূতনকে আবাহনের বাণী—

"উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্রশঙ্খ বাজে।

মোর চিত্তমাঝে চিরনূতনেরে দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ।" (৫ম স্তবক)

নির্বাচিত কবিতার বিশ্লেষণী পাঠ বস্তুত 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি পুণ্য জন্মদিনের স্মরণ-উৎসব উপলক্ষ্য করে নবজাগরণের আনন্দে ও উজ্জীবনমন্ত্রে কবির উদ্বোধিত হওয়ার বাণীরূপ। একটু নাটকীয় ভাবে, মিশ্রছন্দে মুক্তবন্ধের দোলায় চিরনূতনকে বরণ করে নবজীবনের আনন্দে মেতে ওঠবার প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল কবিতাটি।

১২.৪ তপোভঙ্গ

মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য 'কুমারসম্ভব'-এর ভাবছায়ায় কবিতাটি রচিত। তারকাসুরের অত্যাচারজর্জরিত দেববন্দ দেবলোকের কল্যাণের জন্য উমা মহেশ্বরের মহামিলন কামনা করেছেন। পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো ললিত দেহ-লাবণ্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চরণে-প্রণত হয়েছেন। কামদেব মদন ও তার সহচরসখা বসন্তের সহায়তায় চারদিকে অকাল বসন্তের সমারোহ ঘটেছে। কুমারজন্মের জন্য উমা-মহেশ্বরের মিলনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গলো, কিন্তু তার রোষের আগুনে সৌন্দর্যের দেবতা মদন পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। সুলজ্জিতা উমা মহেশ্বর মিলনের অন্তরায় নিজের রূপকেই ধিক্কার দিলেন, কেননা, চারুতা বা সৌন্দর্য প্রিয়জনকে সুভগ করে, তাকে পীড়িত বা রুষ্ট তো করে না -

‘তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং

পিনকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।

নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী

প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।।’ (কু:স.৫/১)

উপেক্ষিতা-অনাদৃতা পার্বতী এবার রূপমুগ্ধতার পথ পরিহার করে দুঃখব্রত ও তপশ্চর্যার পথ গ্রহণ করলেন। তা না হলে তাঁর সুমঙ্গল প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও শিবের মতো পতিলাভ কী করে সম্ভব হবে!-

“ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং

সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং

তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥”(কু.স.৫/২)

তারপর কল্যাণী উমা তপের দ্বারা শুদ্ধা ও জ্যোতির্ময়ী হয়ে মহাদেবের পূজায় নিজেকে অর্ঘ্য দিলেন। শুভফলও পেলেন তিনি, লাভ করলেন শিবের মতো পতি। জয় হলো তার অলোকসামান্য প্রেমসাধনার। তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দুঃখসাধন, ত্যাগ প্রভৃতি প্রেমতপস্যার বিরল ঐশ্বর্য দেবাদিদেবের প্রেমঘন করুণাঘন দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। স্বতঃপ্রণোদিত মহাদেব দেবতাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য স্বভাববিরুদ্ধ সংসারধর্ম পালনে সম্মত হলেন এবং তপঃপূতা উমার পাণিগ্রহণ করলেন। অর্থাৎ প্রেমের কাছে যোগীশ্বর-মহেশ্বর শিবের পরাজয় ঘটলো। যথার্থ প্রেম সে সহজলভ্য নয়, বহু তপস্যার, বহু সাধনার ধন---‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে উমার তপস্যা অংশে (দ্রঃ কু.স. পঞ্চম সর্গ) কালিদাস তা আমাদের দেখিয়েছেন। এই কাব্যে প্রেমের স্বরূপ ও তার ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠাই কবির অভিপ্রেত ছিলো। বিবাহ সংসারধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং সেই ধর্মের সঙ্গে প্রেম-সৌন্দর্য ও মঙ্গলের আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে আছে ভারতীয় সংস্কারে। ধর্ম-সৌন্দর্য

প্রেম ও মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে তা পরিণামে কল্যাণময় অনন্দময় ফল দান করে। কুমারসম্ভব কাব্যের ব্যাখ্যায় প্রেমসম্পর্কিত এমনই এক উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—"ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে।" (দ্রঃ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা— প্রাচীন সাহিত্য) উমা-মহেশ্বরের প্রেম ও মঙ্গলমিলনের অনুষঙ্গ কুমারসম্ভবের অনুসরণে রবীন্দ্রকাব্যে প্রবন্ধে-উপন্যাসে চিঠিপত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে উঁকি দিয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' –'কুমারসম্ভাব ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) উমা-মহেশ্বরের বিবাহকেন্দ্রিক বিষয়টি অনুভূতিপরায়ণ ও সংবেদনশীল কবিচিত্তে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্রিক্ত করেছে—

"... ভব-ভবানীর প্রেমগাথা

নিরাসক্ত নিরাকার্ভক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর

কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বলসুন্দর

বাহুর করুণ আকর্ষণে, কিছু নাহি চাহি যাঁর

তিনি কেন চাহিলেন— ভালোবাসিলেন নির্বিকার—

পরিণয় পাশ।..." ইত্যাদি (উৎসর্গ— ২৬ সংখ্যাক কবিতা)

'তপোভঙ্গ' কবিতাটির রসবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুমারসম্ভব কাব্য ও পূরবী পর্বের পটভূমি সমানভাবে বিবেচনা করে আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুমারসম্ভবের ভাবছায়ার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধে ভারতীয় প্রেমসংস্কারের ঐশ্বর্য ও মহত্বের উপর অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় ধূর্জটির ধ্যানমগ্নতা ও ধ্যানভঙ্গের গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণের পশ্চাতেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রেমের আদর্শ। সেই আদর্শই উমা-মহেশ্বরের মিলন সাধন করেছে এবং সেই মঙ্গলমিলনের রাগ-অনুরাগমিশ্রিত বিচিত্র ছবিটি ধরা পড়েছে মহেন্দ্রপ্রেরিত দূত কবির অন্তদৃষ্টিতে।

‘তপোভঙ্গ’ স্মৃতিচারণার আবেশে মুখর একটি কবিতা। কবিতাটি নবচেতনা ও জীবনরসে সঞ্জীবিত। প্রৌঢ়ত্বের আশাহত কবিমনে নতুন করে যৌবনকে ফিরে পাওয়ার আশা জেগেছে।

কুমারসম্ভবের শিবের মতো কবিরও আপিতবার্ধক্যের আবরণ আসলে তার যৌবন-মানসকে নতুন করে ফিরে পাবার একটা সাময়িক ছলনা মাত্র।

বস্তুত কবির কাছে যিনি শিব (শিব), তিনিই সুন্দর (সুন্দর)। কবি শিবের পূজারী, সুতরাং সুন্দরেরও পূজারী। শিব মহেশ্বর হলে কি হয়, তিনি যে আবার সুন্দর! একসময়ে যুবা কবি ভোলানাথের যৌবনচঞ্চল দিনগুলি রঙে-রসে-চারুতায় প্রাণোচ্ছলতায় ভরে দিয়েছিলেন। আজ তার বার্ধক্যে ভোলানাথ যেন তাকেই ভুলে ছলনাময় তপস্যায় মগ্ন। অথচ স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে ধ্যানতন্ময় ধূর্জটির তপোভঙ্গের চক্রান্তে কোনো এক যুগে মহেন্দ্রপ্রেরিত কবি-দূত রূপে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। যুগে যুগে কবিগণই তো সব ছেড়ে সুন্দরের, ভীষণের-ভয়ঙ্করের আহ্বানে সাড়া দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। বর্তমান কবি-শিরোমণিও তার ব্যতিক্রম নন। তাই ধূর্জটির তপোভঙ্গে কবিরূপে তার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা নেই—

“তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র-সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী-
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি।” (তপোভঙ্গ—পূরবী)

প্রণয়ের দেবতা মদন আর প্রেমিক-কবি ধর্মের দিক থেকে অভিন্ন। পুস্পধনুর মতো কবির গানও বসন্তের মাধুরীকে ভাষাদান করেছে। সেইজন্য তপোভঙ্গের চক্রান্তে কামদেব ও কবি— দুজনেই পেয়েছেন শাস্তি। কামের পরিণতি হরকোপানলে দগ্ধ অঙ্গারে, আর কবির— তারুণ্যের অবরোধে। মহাকাল শিব যেন কবির সুধারসের পেয়ালাটিকে আপন জটার অন্তরালে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনিও চান একান্তভাবে ধরা দিতে চিরসুন্দরের কাছে যে সুন্দর ধ্যান-তপস্যাযযাগে সুন্দর। কল্যাণী উমার কাছে ধরা দেবার জন্যই বোধহয় তার কপট ছদ্মরেশ। বিনাশের মধ্যেই তার সৃষ্টির আহ্বান। সেই আহ্বানকে সফল করে তুলবে কে? কবির ছন্দোময়ী বাণী। মহাকাল শিবের মনোগত অভিপ্রায়টি কবির মাধ্যমে চরিতার্থতা লাভ করে বলেই তার সঙ্গে কবিসত্তার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কবিরা যে চিরসুন্দরের দূত।

সেইজন্য বর্তমান কবিরও বিশ্বাস, তার যৌবনরসে উচ্ছল অতীত দিনগুলি পরিণত বয়সেও আবার ফিরে আসবে। মহাকালের ছলনার ভান ও তার মূল অভিপ্রায়টি তিনি ঠিকই বুঝে ফেলেছেন। সুতরাং চিরযুবাও চিরজীবীত্বের অধিকার নিয়েই অমর। কবির আসনটি তিনি লাভ করবেন না কি?

“হে শুষ্ক বন্ধধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—

সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব।

ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে

অগ্নিতেজে দগ্ধ করে

দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তৃণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে।

আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে

মৃত্তিকার কোলে।” (তপোভঙ্গ—পূরবী)

‘কুমারসম্ভব’-এর উমার তপস্যার গৌরবময় কাহিনীটি রবীন্দ্রভাবনার স্পর্শে কেমন সমুন্নত মহিমা লাভ করেছে। তবে শিবের ধ্যানতন্ময়তার তাৎপর্য কালিদাস কোথাও স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করেননি— রবীন্দ্রানুভবে সেই তাৎপর্য স্পষ্ট হয়েছে। যেমন ‘তপোভঙ্গ’ কবিতায় কবিতাটির গূঢ়ার্থ, তার মর্মবাণীটি যেন কবি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কোনো ভাষ্যকার, কোনো ব্যাখ্যাতা যার সন্ধান পাননি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সান্দ্র অনুভূতিতে তা ভাব-রসঘন প্রকাশরূপে সমুজ্জ্বল হয়েছে। কবি খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে ছলনাময় শিব সুন্দরের কাছে পরাভব স্বীকার করে ধরা দেবার জন্যই ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন—

“জানি জানি বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে!” (তপোভঙ্গ—পূরবী)

দুখের পরিণতি আনন্দে। মিলনের মধু লগ্নটিকে সার্থক করে তুলতে মাঝে যেন ইচ্ছা করেই একটি দুঃখ-সাধন অধ্যায়ের সৃষ্টি- যেটি সাময়িক, যেটি নিতান্তই রুদ্রের ছলনা! উমাকে দুঃখ দিয়ে শিব যেন মিলনের ক্ষণটিকে আরও দীপ্ত, আরও সুন্দর করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বিনাশের পথে রুদ্রের সষ্টির ইঙ্গিত অথবা দুঃখের ছদ্মবেশে মিলন-অভিসার কিম্বা আনন্দের জয়যাত্রা— এইরূপ তত্ত্ব-দর্শন উপনিষদ ও কুমাররাবীন্দ্রিক অনুভবের উজ্জ্বল প্রকাশ। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এই তত্ত্ব-দর্শনলালিত ভাবনাটি বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রত্যয়ের মহিমা অর্জন করেছে।

‘তপোভঙ্গ’ কবিতাটি আরও বিশেষ একটি কারণে রবীন্দ্রকাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে যুগ-যুগান্তরে ব্যাপ্ত রূপান্তরিত কবি-আদর্শের পরিচয় আছে। কবির অনুভবে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে—

"ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি

দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী

আমি সেই কবি।"

"কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে সৌন্দর্যের আরতি করে এসেছেন। বৈদিক যুগ থেকে কালিদাসের যুগ, কালিদাস থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত নানা রপান্তর জন্মান্তরের ভিতর দিয়েও তার সেই সুন্দর-বন্দনার অপরিবর্তিত রূপটি চির বিরাজমান। যেন সর্বকালের কবিদের ভাবসমন্বয় ঘটেছে একক কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।" (রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'– ২য় সং, পৃ ২১৮ কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) | তাই যেন মিলনের মধুমাসটিকে সর্বার্থেই পূর্ণ করে তাোলবার জন্য যুগে যুগে ডাক পড়েছে কবির। বার্ধক্যের সন্ন্যাসের ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে কাব্যের ইন্দ্রজালে মহাকালকে বরবেশে সাজিয়ে দিতে হয়েছে কবিকে। আর তাতেই বর্তমান প্রৌঢ় বয়সেও যেন মহাকালের দরবারে কবির চিরযৌবনের অধিকার পাকা হয়েছে। তখন স্বয়ং উমার সম্মতিতে সুন্দরের পূজায় কবির অন্তরেও বিরাজ করেছে চিরশান্তি- আত্মপ্রসাদ-

"কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে;

সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে

কবির পরাণে।"

(তপোভঙ্গ—পূরবী) কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য রবীন্দ্র রসপুষ্টিতে কেমনভাবে সহায়ক হয়েছে তার একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'তপোভঙ্গ' (পূরবী) কবিতাটি।

১২.৫ আগমনী

'আগমনী' কবিতাটি চিরযৌবনের, চিরনবীনের আবাহন-গীতি। প্রকৃতি-জগতে শীতের জড়তা-মন্থর আবহে যখন কাঁপনলাগা বাতাস বইতে থাকে, শুরু হয়ে যায় শুষ্ক বিশীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজির ঝরে পড়ার পালা— তারই ফাঁকে অলক্ষ্য চরণসম্পাতে নিঃশব্দে কখন যে বসন্তের আবির্ভাব ঘটে তার টের পান কজন? তার পায়ের ধ্বনি আমরা অনেকেই

শুনতে পাই না সত্য কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি তাকে স্বাগত জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। বসন্তের উতল হাওয়ায় গাছে গাছে কচি পত্রোদগম, পুষ্পমঞ্জরীর আবির্ভাব, দোয়েল-শ্যামা-কোকিল-কপোতের সুমধুর কণ্ঠরব সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়ে দেয় তার আগমন বার্তা শিহরিত আমলকী বনের মর্মরধ্বনি তারই সংকেত। কীভাবে তার আগমন ঘটলো? চিত্তবিমোহন উৎপ্রেক্ষার লহরী তুলে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশরূপ দিয়েছেন কবি—

"গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে—

পায়ের ধ্বনি নাহি।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে

দখিন হাওয়া বাহি।

অশোক বনে নবীন পাতা

আকাশ-পানে তুলিল মাথা;

কহিল, 'এসেছ কি।'

মর্মরিয়া থরোথরো কাঁপিল আমলকী।"

চিরনবীনের, চিরসবুজের, চিরতারুণ্যের ও চিরযৌবনের বার্তাবহ সৌন্দর্যের দেবতা পুষ্পধনু সহচর ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে আলোড়ন পড়ে গেছে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতিতে। কিন্তু প্রকৃতিরাজ্যের সেই মহোৎসবে মানবচিত্ত কতখানি সাড়া দেয়। প্রকৃতিতে যার উজ্জ্বল আভাস– মন তাকে গ্রহণ করতে পারে কই? বাইরের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে যার আগমন, মনের মধ্যেও তার ছায়া। প্রকৃতি ও মানবমন এক হলে তবেই না বসন্তরূপী নবীনের পৃথিবীতে আগমন সার্থক। সুতরাং অন্তর দিয়ে তাকে বরণ করে নিতে না পারলে, অন্তদৃষ্টি জাগ্রত না হলে কাছের জিনিসকে দূরের বলেই মনে হয় এবং মনের মধ্যে ধন্দ সৃষ্টি হয়—

"পুলকে কাঁপা কনক-চাঁপা বুকের মধু-কোষে

পেয়েছে দ্বার-নাড়া,

এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে

দিয়েছে তারি সাড়া।

সহসা বনমল্লিকা যে

পেয়েছে তারে আপন-মাঝে,

ছুটিয়া দলে দলে

'এই যে তুমি, এই যে তুমি', আঙুল তুলে বলে।"

সংবেদনশীল প্রৌঢ় কবিচিত্তও প্রকৃতির এই আনন্দ মহোৎসবে নেচে উঠেছে। মানসপদ্মে তিনিও চিরনবীনের আগমনী শুনতে পেয়েছেন, প্রৌঢ়ত্বের আবরণ উন্মাোচিত করে যৌবনেব আনন্দোল্লাসে মেতে উঠেছেন, অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছেন, সৌরভে, শোভাসম্পদে পূর্ণ তার প্রবর্তনা -

"ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,

হৃৎকমলে দেখ সে ছবি,

ভাঙুক মোহঘোর।

বনের তলে নবীন এল মনের তলে তোর।।"

তাই পূরবীরাগে সুর ভঁজতে অভ্যস্ত কবিসকল বিমর্ষতা-বেদনা, অবসাদ-জরা-মালিন্য উত্তীর্ণ ভাবের জগতে শেষবারের মতো ভোরের নবীন আলোয় নবজাগরণ ও জীবনের আনন্দে আর একবার দুলে উঠতে চান। নবীন বসন্তের শুভ আগমনে তার চিত্তলোক অতীতের আনন্দময় যৌবনোচ্ছল দিনগুলির মতো রঙে-রসে-মাধুর্যে-সুষমায়-সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক। আত্মবিশ্বাসী কবির শেষবারের মতো প্রার্থনা, সেই উদ্বোধিনী বাণী

"আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নবরবি

বাজ রে বীণা বাজ।

গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ রে দুলে কবি,

ফুরালো তোর কাজ।

বিদায় নিয়ে যাবার আগে।

পড়ুক টান ভিতর-বাগে,

বাহিরে পাস ছুটি।

প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি।"

– এই উজ্জীবন-আশ্বাসেই কবিতাটির সমাপ্তি।

১২.৬ অনুশীলনী

১। 'পূরবী' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

২। 'মাটির ডাক' কবিতায় রবীন্দ্র দর্শন সম্পর্কে লেখ।

৩। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির নামকরণ কতদূর যথাযথ হয়েছে আলোচনা করো।

৪। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির ভাব রূপ আলোচনা করে এটি কতদূর স্মৃতিচারণার কবিতা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

৫। 'আগমনী' কবিতাটির কিভাবে যৌবনের কথা বলেছে আলোচনা করো।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র বিশ্বভারতী সং)।

৩। যাত্রী (বিশ্বভারতী সং)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্বভারতী)–
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং)- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং)- প্রমথনাথ বিশী।

৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ)— প্রমথনাথ বিশী।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং)
কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং)- শঙ্খ ঘোষ।

১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীসম্পাদিত ১ম
সং)।

একক ১৩ কবিতা বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

১৩.১ লীলাসঙ্গিনী

১৩.২ বকুল বনের পাখি

১৩.৩ সাবিত্রী

১৩.৪ লিপি

১৩.৫ শেষ বসন্ত

১৩.৬ অনুশীলনী

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ লীলাসঙ্গিনী

বিশ্বস্রষ্টার মহান সৃষ্টির লীলা-নিকেতন এই পৃথিবী। সকল মহৎ সৃষ্টিকর্মের পশ্চাতে স্রষ্টা পুরুষের সঙ্গে এক লীলা-সহচরীর কল্পনা সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির মতো অবিচ্ছেদ্য। এ নিতান্তই ভারতীয় সংস্কার। ভাববিলাসী কবির জীবনেও সৃষ্টিলীলার পেছনে এক অনিন্দিতা সহচরীর আবির্ভাব বাস্তব। তারই কল্পরূপ অপরূপা বৈচিত্র্যময়ী লীলাসঙ্গিনী।

লীলাসঙ্গিনী কবির নিত্যলীলার সহচর। জীবনসাধনার নানান বাঁকে, নানা রূপে, নানা সময়ে কবিজীবনে সেই রঙ্গময়ীর আসা-যাওয়া। হয়তো কবিজীবনের বিচিত্র লগ্নে আবির্ভূত রক্তমাংসের কোনো মানবীর ভাবরূপকেই তিনি সঙ্গিনী, সহচরী, প্রেরণাদাত্রী সৃজনের দেবীর আসনে বসিয়েছেন। রবীন্দ্র কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে যে নারীর বিভিন্ন

বিচিত্র বেশে আগমন তাঁকে কবি সমসাময়িক আত্মভাবচেতনার আবহে ভিন্ন ভিন্ন নামোপাধিতে ভূষিত করেছেন। কবির বহিরঙ্গ জীবনের একদা ভালোলাগা ও ভালোবাসার পাত্রী কবিকল্পনার সান্দ্রতায় ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভাব ও ভিন্ন মাত্রাভূষিতা হয়েছেন। বাহ্যিক জীবনের সঙ্গিনীদের ভাবনির্যাস থেকে কবির অন্তজীবনে তৈরি হয়েছে মানবী ও দেবীর মিলিত ভাবরূপ। এক একটি কাব্যের আবহে এই নারীর নাম ও উপাধি, গুণগত ঐশ্বর্যমহিমা বিকশিত হয়েছে। কখনো তিনি কবির প্রেয়সী— আজন্মসাধনধন' সুন্দরী কবিতাকল্পনালতা' (মানসসুন্দরী সোনার তরী), কবির কৈশোর জীবনের 'প্রথম প্রেয়সী', তার 'ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী', 'নবীন বালিকা মূর্তি' খেলার সাথী, তিনিই আবার মানবী অস্তিত্বের ভাবময় সুবাস 'মানসসুন্দরী'। সেই একই মানবী বালিকা 'চিত্রা'র পরিণত ও সমুন্নত কল্পনায় কবিসৃষ্টির প্রেরণাময়ী আদিসৃষ্টি 'জীবনদেবতা'। বাইরের জগতে যিনি বিচিত্ররূপিণী, ছলনাময়ী নারী, যিনি আপনার সৌন্দর্য ও মোহ বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কবিকে আচ্ছন্ন-আবিষ্ট করেন, তিনিই আবার কবির অন্তর্জগতে শুধু তারই একান্ত আপনার জন দেবী যিনি কবির সকল অন্তরাকাশ আলোকিত করে বিরাজমান কবি-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী— তাঁর জীবনদেবতা'—'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা-একাকী/তুমি অন্তর ব্যাপিনী।' (জীবনদেবতা— চিত্রা)।

কবি জীবনের বিচিত্রলীলার সহচরী যিনি নানাভাবে, নানারূপে, নানারঙ্গরসে কবি অন্তরকে নিয়ত আলোড়িত করে সুধাবর্ষণ করে চলেছেন, তিনিই কবির জীবনদেবতা। ইনি বাইরের বহুজনপূজ্যা কোনো লৌকিক মানবী কিম্বা দেবী নন, কেন-না, তার অধিষ্ঠান কেবল কবির হৃদয়ের অন্তঃপুরে আপন প্রকৃতির মধ্যে। কবিকল্পনার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর লীলা একান্তই কবির আত্মস্বরূপের মধ্যে। মহাকবি দান্তের যেমন 'বিয়াত্রিচে', ভাববিহারী কবি শেলীর যেমন 'Intellectul Beauty', তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' অথবা কবির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি 'জীবনদেবতা'। গ্রীক সৌন্দর্যের দেবী Afrodites (আফ্রোদিতে)-এর সঙ্গেও তার মিল। কবিজীবনে এই জীবনদেবতার বিচিত্র লীলার কথা স্মরণ করে 'আত্মপরিচয়'-এ কবি লিখেছেন— "... যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপ-রূপান্তর জন্ম জন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য

দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

"ওহে অন্তরতম,

মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ

আসি অন্তরে মম?"

জীবনদেবতা কবির অন্তরে কবি। অন্তলীন এই সত্তাটির কথা স্মরণ করে আত্মপরিচয় এ তিনি লিখেছেন, "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।"
(আত্মপরিচয়— বিশ্বভারতী, জুন-১৯৫৭ পৃ.-১২)

'চিত্রা' কাব্যের জীবনদেবতা তত্ত্বে দৃশ্যজগতে কবির চোখে দেখা নারীর যে ভাবরূপ, তারই আর একপ্রকার উত্তরণ পূরবী'র 'লীলাসঙ্গিনী'। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে কবির যে লীলা তারই ভাবমূর্তি এই লীলাসহচরী— কখনো মানবী, কখনো সৌন্দর্যের দেবী— কখনো 'মানসসুন্দরী'—'জীবনদেবতা' আবার কখনো বা 'লীলাসঙ্গিনী'। কবিতাটির মমার্থ বিশ্লেষণের মধ্যে লীলাসঙ্গিনী তত্ত্বটি অল্পবিস্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। পূরবী পর্বের নষ্টালজিক প্রৌঢ় কবির জীবন রসায়নের অন্যতম উপাদান এই লীলাসঙ্গিনীকে আশ্রয় করে কবি ফেলে-আসা জীবনের বিষামৃত আস্বাদন করতে

চেয়েছেন। এককালের জীবনসহচরী মানবীকে মহাকালের পটভূমিকায় স্থাপন করে কবি 'জীবনদেবতার' আরও আদর্শায়িত উত্তরণ ঘটিয়েছেন 'লীলাসঙ্গিনী'তে।

কবির লীলাসঙ্গিনী যে সবসময় তার নমসহচরী হয়ে কাছে কাছে থেকেছেন আর সৃষ্টির খেলায় যোগ দেবার জন্য কাজের কক্ষকোণে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন এমনও নয়। তার লীলা রহস্যময়তার আবরণে মোড়া, কখনো দৃশ্য, কখনো অদৃশ্য, অনেকটা যেন চতুরা নায়িকার মতো—সে যে পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাকদিয়ে যায় ইঙ্গিতে। প্রবীণ কবির স্মৃতি বাসরে কখনো জাগ্রতা, কখনো বিস্মৃতির গোধূলি আলোকে গুহায়িত চেতনার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এই লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাব কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে দিন-ক্ষণ বিচার করে নয়, আকস্মিকভাবে, হঠাৎ। তাই একদিন অতীত দিনের স্মৃতিচারণরত কবির মনোগহনে তাঁর স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বহির্দুয়ারে তার নিঃশব্দ আগমনে সচকিত হয়ে ওঠেন। তার মনে হয় -

"দুয়ারবাহিরে যেমন চাহি রে
মনে হ'ল যেন চিনি,
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
কাজ ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।" (স্তবক-১)

লীলাসঙ্গিনীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্ময়ে অভিভূত কবি অতীত স্মৃতিচারণার আনন্দে আত্মহারা। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঁকি দেয় মানসীপ্রিয়ার সঙ্গে কবিচিত্তের মঙ্গলমিলনের মধুময় সুখস্মৃতি। সেই স্মৃতিসুরভিত মুখর দিনলিপির তর্পণ আর বার নবজীবনান্দের দৃপ্ত আবেগে যেন বাঁধতে চেয়েছে চিরচঞ্চলা লীলাসঙ্গিনীকে—

"এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত।
কবেকার সম্বল।
চৈত্রহাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।" (স্তবক-২)

স্মৃতির অতল থেকে লীলাসঙ্গিনীর অস্পষ্ট ছবি কবির চিত্তদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার মনে পড়ে গেছে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই রহস্যময়ী নন্দিনীর বিচিত্রখেলা, রোমান্সের মধুমাখা আবেশ—

"মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণঝংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে

ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,

কখনো আমের নবমুকুলের বেশে

কভু নবমেঘভারে।

চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে

ভুলায়েছ বারে বারে।" (স্তবক-৩)

ঋতু-প্রকৃতির আবর্তনে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণে কবির সঙ্গে লীলাসঙ্গিনীর লীলার আহ্বান স্মরণের তুলিতে আঁকা হয়ে যায়—

"নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে

গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

বনপথে আসি করিতে উদাসী

কেতকীর রেণু মেখে।

বর্ষাশেষের গগন কোনায়-কোনায়,

সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়

নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়

ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।

কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে

গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।" (স্তবক-৪)

লীলাময়ী সঙ্গিনীর পুনরাবির্ভাব নানা প্রশ্ন জাগিয়েছে কবির মনে। অতীতেও সেই মানসীপ্রতিমা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে 'লীলাম্বরের তলে' হাতছানি দিয়ে

অকাজের কাজে সাড়া দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজও কি সেই রঙ্গময়ীর পুরাতন ছল। কাজ ভোলাবার জন্যই বারেবারে কাজের কক্ষকোণে আহ্বান!-

"কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা

কাজের কক্ষকোণে।

সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছে একেলা

তব খেলাপ্রাঙ্গণে।

নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে

ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—

অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে

নিষ্ফল আয়োজনে?

কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে

কাজের কক্ষকোণে।" (স্তবক-৫)

লীলাসঙ্গিনীর সেই আহ্বানে সংশয় জাগ্রত হলেও মানসপ্রতিমাগুলিকে সাজিয়ে নেবার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন কবি। কল্পনা-পটে রসের তুলি বুলিয়ে, নেশার বরণে রঙ মিশিয়ে সেই মোহিনীর অসময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে কি? এই প্রশ্নজড়িত সংশয়ের কারণ ঐশ্বর্যদীপিত যৌবনের মাধুর্যসম্পদবঞ্চিত কবির প্রৌঢ় বয়সের মানসদৈন্য ও অবসাদ। মহাকাল যা হরণ করেন তাকে আবার প্রবীণ কবি ফিরিয়ে আনবেন কোন মন্ত্রবলে এই প্রশ্ন

"দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—

সারা হয়ে এল দিন।

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির

শেষ রাগিণীর বীন।

এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,

হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,

আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি

গানহারা উদাসীন।

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,

সারা হয়ে এল দিন।" (স্তবক-৫)

কাল্পনিক জীবনসন্ধ্যায় গানহারা উদাসীন কবি অবেলায় হলেও আর একবার সেই পুরানো দিনের হাস্যোচ্ছল-লোকে ফিরে যেতে চান লীলাসঙ্গিনীর সাহচর্যে। তার সঙ্গে কবির শেষ খেলা শুরু হবে নিশীথ-অন্ধকারে অমাবস্যার পারে আলোকিত তারকাপুঞ্জের মাঝে। দিনের আলোয় যে প্রেমের লীলা মালতীলতার সৌরভে, নীরবে-নিঃশব্দে হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে, আজ অবেলায় তারই পুনরাবৃত্তি হোক রাতের অন্ধকারে নক্ষত্রদীপিত গগনতলে—

"এবার কি তবে শেষ খেলা হবে

নিশীথ-অন্ধকারে।

মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি

অমাবস্যার পারে ?

মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে

তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে?

সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে

নীরবে লভিব তারে ?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা

রচিবে অন্ধকারে?” (স্তবক-৮)

দিন শেষ হয়ে রাত্রি সমাগত হলেও সেই রহস্যময়ী, গোপনরঙ্গিণী, রস-তরঙ্গিণীর ছোঁয়ায় তার চিত্তলোক আলোড়িত নন্দিত। কবি হৃদয়ে শেষবারের মতো তরঙ্গ তুলে তারপর সেই প্রিয়তমা যদি হারিয়ে যান, ভালোবাসা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি তাঁকে ঠিকই চিনে নেবেন। কবিতাটির শেষ স্তবকটিতে কবির সেই উজ্জীবন আশ্বাসে পূর্ণ বসন্তরাগ--

‘যদি রাত হয় না করিব ভয়—

চিনি যে তোমারে চিনি।

চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি

হে গোপনরঙ্গিণী।

নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে

তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,

তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে

হে রসতরঙ্গিণী।

হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,

চিনি যে তোমারে চিনি।” (স্তবক-৯)

১৩.২ বকুলবনের পাখি

‘বকুল বনের পাখি’ রোমান্টিক গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের অনন্ত-প্রসারিত কল্পনার এক সুচারু আলেখ্য। কবিতাটিতে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের কলতান, নিঃসীম নীলিমায় অবাধে আনন্দে ভেসে-চলা প্রভৃতি ধর্মগুলির সঙ্গে নিজের কবি-আত্মার মিল খুঁজে পেয়েছেন কবি। তাই বকুল-বনের পাখিটি যেন ভাববিহারী কবির আবাল্য দোসর। কালের

ব্যবধান সেই সখ্য, সেই হৃদ্য সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কী না তা যাচাই করে নেবার জন্য তার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন কবি—

"শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি।
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি—
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম ?" (স্তবক-১)

'অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু' বকুল বনের পাখিটির সঙ্গে কবির আবাল্য সখ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে, সূর্যালোকে বাতাসের প্রাণকাড়া চাপার গন্ধে, - "সহজ রসের ঝর্ণাধারায়, সহজ সুখে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে। কখনো কখনো এমনও হতো - ঘর ছাড়া বন্ধু পাখিটির মতো তিনিও তো খোলা মনে খোলা হাওয়ায় সব কাজ ফাঁকি দিয়ে আকাশের বুক-ছোঁওয়া কল্পনার ভেলা ভাসিয়ে দিতেন। কখন যে বেলা চলে যেতো তার হুঁশটুকুও বুঝি থাকতো না। তার অধীর মনের মাঝে অনুভূত হতো শ্যামল ধরিত্রীর নাড়ীর স্পন্দন। সেসব কথা কি সেই ছোটোবেলার খেলার সাথী বকুল-বনে পাখিটির মনে পড়ে? সেকি নিঃসংশয়ে তাকে চিনে নিতে পারে?

"শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
কাছে এসেছিন ভুলিতে পারিবে তা কি।
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন সুখে
সারা আকাশের ছিনু মৈন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে

শ্যামলা ধারার নাড়ীতে যে তাল বাজে।

নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।”

আরও কতো স্মৃতিই না কবিমনে ভর করেছে। প্রৌঢ় জীবনের পড়ন্ত বেলায় বাল্যস্মৃতির তর্পণে আপন ভাবনা ও কবিধর্মের সঙ্গে বনবিহারী পাখিটির ভাবঘন, আনন্দঘন মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আজ যখন তিনি দেশ ছেড়ে সুদূর প্রবাসে, তখনো যে সেই অতীতের স্মৃতিগুলি চিত্তে ভিড় জমায়। তার মনে পড়ে আষাঢ়ের জলভারনত মেঘ, কলস্বনা স্রোতস্বিনী। তারা সব হয়তো তেমনই আছে, কিন্তু তিনি দূর-প্রবাসী !তাদের সবার সঙ্গে মিলে যে কবিসত্তার বিকাশ সেকথা মনে করে বেদনায় আচ্ছন্ন তার চিত্ত। আর সকলে তাঁকে তাঁর ছেলেবেলাকে ভুলে ভুলুক, কেবল প্রিয়বন্ধু বকুল বনের পাখিটি যেন তাকে না ভোলে। সে যে তাঁকে ভুলবে না- এই আত্মপ্রসাদ অভিমানী কবিচিত্তকে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করে তুলেছে-

“বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে

কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?"

এর সদুত্তর যাইহোক, বকুলবনের পাখিটির সঙ্গে তাঁর সে মিতালির সম্পর্ক এই বার্ধক্যেও কবিমনে অটুট, তার মৃত্যু নেই। ধরার খুশি, ধরার আনন্দে উচ্ছল পাখিটির কলগান যেন সর্বত্র বিরাজমান তেমনি তাদের সবার সঙ্গে ঐক্যসূত্রে ঐকতান সঠি করেছেন কবি নিজেও। তাইতো বকুল-বনের পাখিটির সঙ্গে রাখিবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান তিনি।

---“শোনো শোনো ওগো বকুল বনের পাখি

আর-বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে নাকি।

যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,

ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে।

আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে

তোমার গানের রাখী।

আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,

বিদায়ের আগে ওগো আপন করে।" (স্তবক-৫)

তার বিশ্বাসী কবিমন বিষন্ন বিদায়বেলায় আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন এই ভেবে যে জীবন সমদ্রের ঘাটে শেষ তরীটি ভাসিয়ে দেবার আগে তিনি জেনে যাবেন, তার সকল গানের 'সুরের সুরার সাকী' বন্ধু বকুল-বনের পাখি আজও তাঁকে ভোলেনি এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে তার শেষের সুরের পেয়ালা ভরে দেবে। এই স্বস্তির আনন্দে বর্তমানের খ্যাতি কীর্তি, কর্ম-যশ প্রভৃতি সব হেলায় তুচ্ছ করে, গানের পাখায় ভর করে তিনিও যে উড়ে যেতে চান অনন্ত আকাশে, মুক্ত দিগন্তে, অনন্ত বিশ্বলোকে। তার প্রার্থনা, সাথী বকুল-বনের পাখি তার ললাটে এঁকে দিক মুক্তির টীকা

"শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি;

মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।

যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,

খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,

কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,

কীর্তি যাকনা ঢাকি।

ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে

চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।"

আভিজাত্যের অহংকারমুক্ত কবি নামহারা সাধারণ ব্যক্তির মতোই সহজসরল পথে কোনো পিছুটান না রেখেই সন্ধ্যায় ঝরে পড়া ফুলের মতো, রাত-ভোরের তারার মতো, হাওয়ার মতো বনের গন্ধ হয়ে গান গাইতে গাইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করতে চান। তাঁর সেই অবসর যেন সহজ হয়, সুন্দর-আনন্দময় হয়, যেন বেণুপল্লব-মমন্তরিত

সংগীতের মূর্ঘনায় দিনান্তের শেষ সোনালী সূর্যের আলোয় মিলিয়ে গিয়ে তার প্রস্থান পর্বটি উজ্জ্বলতর ও স্মরণীয় হয়।

"শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে ।
চলে যাই গান হাঁকি।
বেণুপল্লবমরর সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলিখনে।"

কবিতাটির শেষ স্তবকে বিদায়-বেলার বিষন্নতা মৃত্যুর আবহ রচনা করেছে। জন্ম রোমান্টিক গৌরবোজ্জ্বল কবির এমন অনাড়ম্বর শেষ বিদায়ের কল্পনা তার নিরহংকা স্বভাববিনয়ী, স্নিগ্ধ কবিব্যক্তিত্বকেই মহিমান্বিত করেছে।

১৩.৩ সাবিত্রী

সাবিত্রী কথাটির মূল অর্থ সবিতৃ> সবিতা বা সূর্যদেব-সম্বন্ধিনী গায়ত্রী—সূর্যের তেজ বা আলো। যুগভেদে ও কালভেদে শব্দটি বহু অর্থদ্যোতনা নিয়ে ধরা দিয়েছে। কখনো তিনি সূর্যকন্যা, কখনো ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী, কখনো বা দেবী সরস্বতী। বহ্নিপুরাণ অনুসারে তিনি বেদ-প্রসবিতা সাবিত্রী—'বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ।' রবীন্দ্রনাথ সূর্যের তেজ বা আলো অর্থেই সাবিত্রী পদটিকে গ্রহণ করেছেন।

ঋগ্বেদে সূর্যকে স্থাবর-জঙ্গম জগতের আত্মারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি জাবেদা অগ্নি। অগ্নি থেকেই জগতের আলো, অন্ন, প্রাণ সকলের উদ্ভব। এমনকি পরমজ্ঞানের

আশ্রয়ও তিনি— 'বেদান্তদর্থং জাতা বৈ জাতবেদাস্ততোহ্যসি।' (মহা.২.৩১.৪২) এবং 'উৎপন্ন সর্ববস্তুবিষয়জ্ঞানাগ্নি।' (ঋগ্বেদ-১০.১৫.১৩) ঈশোপনিষদে তিনি পূষণ— জগৎপোষক সূর্য। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সাবিত্রী পদত্রী যখন 'গায়ত্রী' মন্ত্রে আবৃত্ত, তার মধ্য দিয়েই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সবিতৃ দেবতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি বলা হয়ে গেছে—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ?।" (ঋগ্বেদ-৩.৬২.১০)

অর্থাৎ যিনি ভূলোক-ভুবনলোক ও স্বরলোক ব্যাপ্ত করে প্রকাশিত, যিনি আমাদের ধীসকল দান করেছেন সবিতৃদেবের সেই বরণীর তেজকে ধ্যান করি (ধারণ করি)। সকল বস্তু, সকল বিষয়, সকল জ্ঞান সাবিত্রী (সূর্যের আলোক)-সঞ্জাত। আলো না থাকলে জড় অথবা জীব—কোনো জগতেরই অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। আবাল্য উপনিষদীয় ভাবপরিমণ্ডলে লালিত-বর্ধিত কবি বিশ্বসৃষ্টির বিকাশে সূর্যদেবতার অবিস্মরণীয় অবদানকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ ও স্বীকার করেছেন। বস্তুত সূর্যই পৃথিবীর প্রভু। তিনি আলো দান করেন বলেই জড় ও জঙ্গম জগতের অস্তিত্ব টিকে আছে। সূর্য ও তার আলোকে অভিন্ন জেনেও বোধের বিকাশ ও ভাববস্তুকে স্ফুটোজ্জ্বল প্রকাশরূপ দানের জন্য তাঁর দ্বৈতসত্তা কল্পনা। শক্তিমান সূর্য এবং তার শক্তি আলো। সকল তেজ, সকল আলোর আধার তিনি। রবীন্দ্রজীবনে বহু রচনায়, আভাষণে জগৎরক্ষায় সূর্যদেবতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। এমনকি সূর্যকে আপন সত্তার (রবি) প্রতিরূপে স্থাপন করে তার সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক কল্পনা করেছেন। প্রসঙ্গত 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' প্রবন্ধে বিশ্বজীবনে সৃষ্টিরক্ষায় সূর্যের আলোর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। 'সাবিত্রী' কবিতা-পাঠের ভূমিকাস্বরূপ 'যাত্রী' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে।

সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাইরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ঐ তেজই মানস-ভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায়-ভাবনায়-বেদনায়-রাগে-অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুকে মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হলো। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল স্বরূপ নয়, যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।.... আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন তমসো মা জ্যোতির্গময় অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তারা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তারা বলেছেন— ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করেছেন। ঈশোপনিষদে বলেছেন— হে পূষণ, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি, আমার মধ্যে যিনি, সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।" (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথ চিলি যাবার পথে হারুণা মারু জাহাজে বসে এক মেঘলা দিনের আবহে 'সাবিত্রী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কবিতাটির মূল ভাববস্তু যা তার অনেকটাই যেন ব্যাখ্যার আকারে বলা হয়ে গেছে 'যাত্রী' প্রবন্ধ-গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশে। কাব্যে যা প্রকাশিত হয়েছে, তারই প্রাঞ্জল গদ্য ভাষারপ যেন 'যাত্রী'র লেখায়। একটু পল্লবিত করে তিনি আরও যা লিখেছেন তাকে 'সাবিত্রী' কবিতার ভাষ্যরচনা বললে অত্যুক্তি হবে না। কবি লিখেছেন -

"এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ, সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে—হে পূষণ, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি, অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশীতে তোমার আলোকের নিঃশ্বাস পূর্ণ করো, সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার

চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে, তখনি তো ভূর্ভুব স্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং, আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখ-দুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্প-পল্লবের বর্ণে-গন্ধে এবং অন্তরের রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিকরে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে-দিগন্তে বেজে ওঠে। তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে। ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চল। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাত-প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, এত ভাঙা, এত গড়া— তারই সারথ্যে যুগ-যুগান্তরের এমন রথযাত্রা। তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল-ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে, মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বল্‌ছে— অপবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে— আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণরূপ দেখি। হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক— সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।" (যাত্রী)

'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও একই ভাবনার কাব্যরূপ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। সূর্যকে বন্ধু রূপে আহ্বান করে: কবির অনুনয়— অশ্রুবাষ্প ভরা দুর্যোগের মেঘকে সৌরতেজরূপ খড়্গাঘাতে বিদীর্ণ করে তাঁর আলোকদীপ্ত সত্যের প্রকাশ হোক্, সকল অন্ধকার-বিদারণ সাবিত্রীর মর্মকোষে সঞ্চিত জ্যোতির কনকপদ্মখানি বিকশিত হোক উদ্বোধিনী বাণীরূপে। কনকপদ্ম-নিঃসৃত সেই আলোকে জন্মের প্রথম প্রত্যুষটি উজ্জ্বল-রক্তিম হয়ে উঠেছিলো প্রীতি-চুম্বনে।

"ঘন-অশ্রুবাষ্পেভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গা হানি

ফেলো, ফেলো টুটি।

হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি

দেখা দিক ফুটি।

বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্ বোধিনী বাণী

সে পদ্মের কেন্দ্র-মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি

মোর জন্মকালে

প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি

আমার কপালে।" (স্তবক-১)

সেই চুম্বন, সেই আলোর স্পর্শ কবিচিত্তে যে 'জ্বালার তরঙ্গ'– অগ্নিপ্রবাহ,সষ্টি, করেছিলো তারই আবেগে সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনাশ্রিত তার সকল সৃষ্টি। বস্তুত প্রাণে প্রাণে, প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যে কবির যে সৃজনলীলা তা তো তার বন্ধু সূর্যেরই দান। সাবিত্রীর অকৃপণ দানেই পূর্ণ হয়ে উঠেছে তার ছিন্নতন্ত্রী প্রাণবীণা।

"এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী;

আয়ুস্রোতমুখে

হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী

বেঁধে নিল বুকে।

আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত

উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরস্ফুরিত

এ উৎসুক আলোক।

তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত

করে মুগ্ধ চোখ।" (স্তবক-৪)

আদিকবি সাবিত্রীর তিমিরবিদারক হোমাগ্নি শিখায় সত্যদর্শনের নির্মল আনন্দে ভরে ওঠে কবিচিত্ত। তমিস্রার সুপ্তিমগ্নতা থেকে জ্যোতির্ময় আলোকের উদ্ভাসনে চরাচরের ছবি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠার আনন্দ প্রকাশিত হয় যেন তার বংশীধ্বনিতে। সে যেন অন্ধকার বিদীর্ণকারী 'তিমির হননের গান।' সেই গান যেন আবিষ্ট করেছে কবির চিত্তলোক। তারই প্রতিভাস মেঘের বর্ণচ্ছটায়, কুঞ্জের মাধবীমঞ্জরীতে, নির্ঝরের কল্লোলে। সেই তরঙ্গচ্ছটায়, ছন্দোভঙ্গের দোলায় আলোড়িত কবিচিত্ত স্পন্দিত হয় জীবনহিল্লোলে—

"তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,

তারে নমো নম।

তমিস্রসুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,

ধ্বংস করি তম,

সে বংশী আমারি চিত্ত,

রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা,

কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরি,

নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি

জীবনহিল্লোল।" (স্তবক-৩)

তাঁর জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল কল্পনা অনুভব, সকল সৃষ্টিরসের উৎসইতো প্রিয়বন্ধুর শক্তি সাবিত্রী। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে তিনি মুক্তির গান গেয়েছেন—

"তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে

কেই বা সে জানে।

কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে

মোর গুপ্ত-প্রাণে।

তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা;

মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা

মুছে যায় সরে।

তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,

না বাঁধুক মোরে।" (স্তবক-৫)

এই যে মুক্তির গানের মূর্ছনা ব্যাপ্ত হোক নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সর্বত্র— অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে, শ্রাবণ বর্ষণে উপলঘর্ষণে মুখরিত নির্বরের মঞ্জির-গুঞ্জনকলরবে, বসন্তের বৈভবে, ঝঞ্ঝামদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়। তারপর ঝঞ্ঝাশেষে শূন্য দিগন্তে বিলীন হয়ে যাক তার মূর্ছনা কোনো চিহ্ন না রেখে।

শরৎ সূর্যের সোনালি আলোয়, শিশিরস্নাত বসুন্ধরার হাসি-অশ্রুতে উন্মন-চঞ্চল কবিচিত্তের সমস্ত আকুলতা বিচিত্র রাগিণীর মূর্জনা সৃষ্টি করে ধেয়ে চলেছে বৈরাগ্যের শূন্যলোকে। কবি যেন জীবনের পড়ন্তবেলায় সেই শিশুকালের মতোই প্রিয়বন্ধুর সমপ্রাণ সখার আলোর প্রত্যাশী। বৈদিক ঋষিকবির মতো তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় কাতর অনুনয়- "হে পূষণ, হে জগৎপোষক সূর্য! সরিয়ে নাও তোমার আবরণ, দেখাও তোমার চিরজ্যোতির্ময়, তেজোময় । রূপ যে রূপের ছটায় অগ্নিউৎসধারায় ধৌত হোক, নির্মল হোক, প্রশান্ত হোক অশান্ত হৃদয়। তার পর গোধূলিলগ্নে তোমার রক্তরাগ দিয়ে কপালে একটি সিন্দুররেখা এঁকে দিয়ো; সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ আলোকবিন্দু দিয়ে কপালে একটি টিপ পরিয়ে দিয়ো। দিনের শেষে যাত্রা থেমে গেলেও সেই সুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি বাজতে থাকুক সিন্ধু তরঙ্গের তালে তালে।"—

"দাও খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হ'ল শেষ

বুকে লও তারে।

শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ

অগ্নি-উৎস ধারে।

সীমন্তে গোধূলিলগ্নে দিয়ে এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,

প্রদোষের তারা দিয়ে লিখে রেখা আলোকবিন্দুর

তার স্নিগ্ধ ভালে।

দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর

তরঙ্গের তালে।" (স্তবক-৮)

রবীন্দ্র রোমান্টিকতার একটি কমনীয় উজ্জ্বল সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল কবিতাটির শেষ স্তবকে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের আগে সত্যসন্ধ ঋষিকবির মতো তিনিও আলোক সমুদ্রে সত্যের সন্ধানী। তার সমগ্র সত্তাচেতনাকে আলোর তরঙ্গে বিলীন করে দিয়ে মুক্তিপিপাসু তিনি। এখানে ঋষিকবির মৃত্যুপূর্বকালীন প্রার্থনার সঙ্গে রবীন্দ্রানুভবের একটুখানি পার্থক্য নজরে পড়ছে। উপনিষদের ঋষির কাছে যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তিনি সূর্য নন, সূর্য তাঁরই অন্যতর শক্তিবিশেষ। অগ্নি, সূর্য, মেঘ (ইন্দ্র), বায়ু ও মৃত্যু সকলই যার দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত তিনিই ব্রহ্ম—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ।" (কঠ-৬।৩)।

ঈশোপনিষদের ঋষিকণ্ঠনিঃসৃত বাণীতেও এর সমর্থন মেলে। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম প্রার্থনা

"হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।

তৎ তং পূষপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" (ঈশ-১৫)

[হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার আচ্ছন্ন। হে পূষণ (জগৎ-পোষক সূর্য), সরিয়ে নাও তোমার কুহেলির আচ্ছাদন। তোমার যে সত্যস্বরূপে তাকে আমি দর্শন করি।] এখানে হিরন্ময় আবরণরূপ সূর্যের আলো আর সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক নন।

ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ দর্শন করতে হলে তার আগে আলোকস্নানে পবিত্র হও। ভাবখানা যেন অনেকটা এই রকম। 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি সাবিত্রীকে কখনো ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে চিহ্নিত করেননি। বরং ব্যক্তিজীবনের ও বিশ্বজীবনের লক্ষকোটি তরঙ্গে নেচে ওঠবার জন্য, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য সূর্যশক্তি আলোর সর্বপ্রকাশক ভূমিকাটিকেই মহিমাভূষিত করেছেন। বলা বাহুল্য, বন্ধু সূর্যের সর্ববিধ্বংসী খরতাপ নয়, স্নিগ্ধ কমনীয় জীবনদায়ী আলো-সাবিত্রীকেই কবি বন্ধুত্বের বরমাল্য সমর্পণ করেছেন। তাতে কবিতাটি বিশেষ ভাবঋদ্ধ ও তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে।

১৩.৪ লিপি

লিপি কবিতাটির ভাব-উৎস হারুনামারু জাহাজে পেরুযাত্রী কবির এক বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ের অনুভব। ৩রা অক্টোবর ১৯২৪ সালের ঘটনা। সবে সকাল, সূর্যের আলো তখনো স্পষ্ট ফোটেনি। জাহাজ থেকে দূরে সমুদ্রতীরের ছবি দেখতে মগ্ন কবিচিত্তে হঠাৎ গুনগুন করে ওঠে ছন্দে গাঁথা কবিতার কয়েকটি ছত্র—

"হে ধরণী, কেন প্রতিদিন

তৃপ্তিহীন।

একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে।

কবি বুঝতে পারেন, হঠাৎ জাগা এই কয়েকটা পংক্তি ভেতরে ভেতরে যেন বিশেষ কোনো ভাবকে প্রকাশরূপ দিতে চাইছে; পংক্তি কটি যেন সেই অভাবিত আগন্তুক কবিতার ধ্রুবপদ। এরপর পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

"সমুদ্রের দুইতীরে যে-ধরণী আপনার নানান-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল,.... আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিনই সেই একই

চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই। সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়, তাই সে এত সরল সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ করাটা আমি মনে-মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে হ'ল নিঃশ্বসিত। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল। এই চিঠি পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনের রূপের ঢেউ।.... এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হলো ঋতুপর্যায়... যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে। একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্ এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইসারায় উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন চোর-কোঠায় ঢোকে; সেখানে কার সঙ্গে কি কানাকানি করে জানিনে; তারপরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে এসেছি।" ['পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' (যাত্রী)]।

আর কথা বিস্তারের প্রয়োজন নেই। ধরণীর বিরহলিপি.... অন্তগুঢ় তাৎপর্য খোদ কবি যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেই আলোকে 'লিপি' কবিতার মমার্থ তুলে ধরা যেতে পারে। আমাদের বোধের জন্যই কবির ভাববস্তুকে মোটামুটি দুটি পর্বে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে। প্রথম পর্বে ধরণীর বিরহ সূর্য থেকে কেন তার ব্যাখ্যান ও বিরহিণী নায়িকার প্রিয়তম-প্রেরিত ভাবলিপির পাঠ উদ্ধারের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় পর্বে যুগ-যুগান্তর ধরে সেই লিপির মর্মোদ্ধারে বিশ্বের কবিকুলের ব্যস্ত-ভূমিকা।

উপস্থাপনা সূত্রে যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ধরণী এক বিরহিণী নায়িকা যিনি প্রতিদিন প্রিয়তমের লেখা চিঠিখানি বুকে নিয়ে তার পাঠে তন্ময় হয়ে রয়েছেন। সুদীর্ঘ

সে। চিঠি, বারংবার পাঠ করেও যেন তার শেষ হয় না, আশা মেটে না। তাই রাত্রেজই চলে আত্মবিস্মৃতা নায়িকার বিলম্বের সান্ত্বনা লিপিপাঠ; সে পাঠের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রভাতের মর্মবাণীতে ভরা সেই লিপিটির উদয়াস্ত পাঠে তাই তার এতো আগ্রহ, এতে। গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু তাতেও যেন তার তৃপ্তি নেই। কবিমনে প্রশ্ন জাগে, কেন তার এই তৃপ্তিহীন পত্রপাঠ? মনে মনে তার একটা সম্ভাব্য উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বহুযুগ আগে কোনো এক শুভক্ষণে বাষ্পের গুণ্ঠন যেদিন খসে পড়েছিলো, সেই দিনই তে। তিনি উন্মুখ হয়ে আকাশের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়েছিলেন। তখন তার সামনে ফুটে উঠেছিলো 'অমর-জ্যোতির মূর্তি'। রোমাঞ্চিত বুকে নিঃশব্দে তিনি তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেই আলোকবরণ মন্ত্রধ্বনি পর্বতের শিখরে শিখরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো, নৃত্যমত্ত সাগরের কল্লোলে তারই উল্লাসধ্বনি, ঝঞ্ঝার উন্মত্ত আবেগে বনে-বনান্তরে তারই জাগরণী। প্রথম দর্শনের বিস্ময় এখনো তাকে রোমাঞ্চিত করে। প্রতি ধূলিকণা তৃণকণা, তৃণরাজি সেই আলোকবরণ মন্ত্রে, বিস্ময়ে আন্দোলিত হয়, ঊর্ধ্বে চেয়ে 'পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে' সেই বিস্ময়ের প্রতিভাস লক্ষ্য করে আনন্দে নেচে ওঠে। দিকে দিকে প্রাণের উল্লাস, প্রলয়ে সৃজনে, রূপে-রূপান্তরে, জীবনমৃত্যুর দোলায় সুখদুঃখের সর্বত্রই সেই বিস্ময়ের ঘোর, সেই আলোকেরই জয়ধ্বনি।

একদিকে সদ্যোজাত ধরণী, অন্যদিকে আলোর দেবতা প্রাণপ্রিয় আলোকপুঞ্জের দেবতা (সূর্য)— প্রিয়তমা ও প্রিয়, বধূ ও বর পরস্পর মিলন-পিয়াসী। কিন্তু তাঁরা মিলতে পারছেন না কেন-না তাদের মাঝখানে অনন্ত নীলাকাশ। তাই কি বিচ্ছেদের লবণাক্ত অঞ নীলাকাশ রূপ খাতার উপর ঝরে পড়ে, রচিত হয় আলোর অধিপতি (সূর্যদেবতা)-প্রেরিত লিপি। এই লিপির অন্তর্লীন তাৎপর্য আজও অজানা। আকাশ থেকে নেমে আসা অগ্নিঅক্ষরে লেখা সেই চিঠির পাঠোদ্ধার আজও শেষ হ'ল না। মর্ম যাইহোক, সেই আলো অগ্নিময়ী বাণীরূপে জীবধাত্রী বিশ্বজননীর মর্মকোষে নিসর্গলোকে, বিশ্বজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে -

"তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;

উর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।

চিরবিরহের নীল পত্রখানি'-পরে

তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।

বক্ষে তারে রাখো,

শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো;

বাক্যগুলি

পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি

মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;

পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে

বন্দী কর তারে;

তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে

রাখ তারে ভরি;

সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল-পল্লবে মর্মরি,

সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;

মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় বিরহিণী ধরণী সূর্যালোকপ্রেরিত সেই চিঠির উত্তর রচনায় উন্মনা, তার সেই প্রয়াস চলেছে তো চলেছেই— অন্তহীন দেশ-কালব্যাপী তাঁর সেই প্রয়াস, অতৃপ্তির বেদনার আগুনে বারংবার তাঁর লেখা এবং পরক্ষণেই তা ছিড়ে ফেলা। এইভাবেই যুগ-যুগান্তর কেটে যায়—

"বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা

আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে।

বারম্বার মুছে ফেল; তাই দিকে দিকে

সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে;

অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে

উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে

সব দাও ফেলে

অবহেলে

আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।

তারপরে আরবার বসে বসে

নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।

যুগযুগান্তর চলে যায়।"

বিরহিণী ধরণীর মনের গাোপন অন্তঃপুর-সংবাদ, তার ভাব ভাষা প্রত্যাশা— সবকিছু উপলব্ধির জন্য যুগে যুগে কত শিল্পী কবিদের যে সে লিপির অনুশীলন তার অন্ত নেই। বর্তমান কবিও সেই একই পিঁড়িতে নিয়েছেন তাঁর আসন। বিরহিণীর ইঙ্গিত, বসনপ্রান্তের ভঙ্গি, অশ্রুসজল দৃষ্টি প্রভৃতি বিরহাবস্থা প্রকাশক যা কিছু তা যদি আজ কবির হৃদয় বীণার তারে ঝংকার তোলে, ভাবে-ভাষায় ছন্দে-অলঙ্কারে যদি তিনি তার অন্তরের গোপন কথা, বিলম্ভের দীর্ঘশ্বাস, কঙ্কণ-কিঙ্কিণীকে সদর্থকভাবে প্রকাশরূপ দিতে পারেন তবে কবি হিসেবে তাঁর জীবন সার্থক হবে। মর্তের বিচ্ছেদপাত্রে বসুধা স্বর্গ থেকে মিলনের যে সুধাপাত্রটিকে সংগোপনে রক্ষা করে চলেছেন, সেই আলোকমালায় স্নান করে তিনিও যেন বেদনার সুতীব্র দাহকে ছন্দে-সুরে-গানে তেজোময় বাণীরূপ দান করতে পারেন। বসুধা ও তাঁর দয়িত আলোকপ্রভু— সকল

আলোর অধীশ্বর সূর্যের মিলনের সুধা কবির বাণীতে মূর্ত হোক, সফল হোক—এই প্রার্থনা -

"দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে

খসিয়া পড়িল তব কেশে,

স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে

উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে

ওঠে যে ক্রন্দন,

মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।

স্বর্গ হতে মিলনের সুধা মর্তের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা;

তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,

বিরহিণী ওয়ি,

মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।"

ভাবৈশ্বর্য ছাড়াও ছন্দোবৈচিত্র্য, ছন্দসজ্জা 'লিপি' কবিতার শৈলীনির্মাণে অভিনব মাত্রা যোগ করেছে।

১৩.৫ শেষবসন্ত

'শেষ বসন্ত' 'পূরবী কাব্যগ্রন্থের 'পথিক' পর্বের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতাটি বুয়েনোস এয়ারিস-এ বসে লেখা, রচনাকাল— ২১শে নভেম্বর, ১৯২৪। পূরবী পর্বের আবহটি পটভূমিকারূপে আদ্যন্ত বর্তমান এই কবিতায়। ভাবঋদ্ধতা, ভাষাসৌষ্ঠব, ছন্দোমাধুর্য এবং অনুপ্রাস-উৎপ্রেক্ষা ও বিরোধাভাস প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের নিপুণ ব্যবহার কবিতাটিকে ভাবঘন রসমাধুর্যে উজ্জ্বল একটি সুন্দর কবিতায় পরিণত করেছে। মিশ্রবৃত্ত বা পয়ার ছন্দে লেখা কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ : উপস্থাপনাতেই কবি স্মরণ করেছেন তার অন্তর্যামী

জীবনদেবতা মানসসুন্দরী লীলাসঙ্গিনীকে। প্রার্থনা করেছেন, দিনশেষের আগেই ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসন্তমেলায় ফোটা বসন্তের ফুলগুলি শুধু এবারের মতো একসঙ্গে কুড়োতে যাবেন—

"শুধু এবারের মতো

বসন্তের ফুল যত

যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।" (স্তব-১)

শুধু এবারের মতো কেন তার কারণটিও ব্যাখ্যা করেছেন কবি। কবির লীলাসঙ্গিনী কোনো বাস্তব রমণীর আদর্শায়িত ভাবরূপ। তিনি শাশ্বতী— কবির চিরকালের চেনা প্রেয়সীর সঙ্গেই তো তার জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী লীলা। ("লীলাসঙ্গিনী' কবিতালোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।) মহাকালের প্রবাহে সীমায়িত জীবন নিয়ে মানবের লীলা। কিন্তু মূর্ত জীবনসঙ্গিনীই যখন জন্মান্তর-সৌহৃদ্যে চিরকালের বিমূর্তপ্রেয়সী, তখন তার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। চিরন্তনী একটি ভাবের প্রবাহই যেন জন্ম-জন্মান্তরে নারীরূপ ধরে কবির সঙ্গে প্রেমের, সখ্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। সেই নারীরই ভাবরূপ কবির মানসসুন্দরী। অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-দোসর প্রভৃতি।

পূরবীর যুগে কবিমনের সাময়িক বিষাদ-অবসাদ-অসুস্থতা তাঁকে জীবনের পরিণ সত্যের মুখোমুখি করেছিলো। মনে হয়েছিলো তার জীবনলীলার শেষপর্বে দিনশেষে শেষ ছায়াখানি তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন পূরবীর ছন্দে 'শেষ রাগিণীর বীন' তিনি শুনতে পেয়েছেন। কবির সেই সাময়িক দৌর্বল্যকেন্দ্রিত কল্পনাবিলাস মৃত্যুর ছায়ায় বিলীয়মান অস্তিত্বের শেষটুকু নিয়ে শেষবারের মতো সকল দুঃখ-দৈন্য-দ্বিধা-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ আনন্দরসে অবগাহন করবার আকাঙক্ষায় উদ্বেল হয়েছে। তাই তার প্রত্যাশা—শেষ বসন্তের সমারোহে যৌবনের ফোটাফুলগুলি লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে এক সাথে শেষ বারের মতো কুড়িয়ে প্রেমের গৌরব, সৌন্দর্যের তৃষ্ণাকে অপার মহিমা-ভূষিত করে যাবেন। চিরন্তনী— শাশ্বতী তো প্রতিজীবনেই তাঁর লীলার সাথী। কিন্তু মহাকাল তো তাকে নির্দিষ্ট পরমায়ু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই জীবসীমার মধ্যেই তিনি প্রিয়তমার

সঙ্গে বসন্তের রঙে, বসন্তের রসে, সৌন্দর্যে উচ্ছলতায় আনন্দে মেতে উঠে জীবনের শেষ খেলাটুকু খেলতে চান। তার এ সময়ের রোমান্টিক আবেগটুকু কী সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি!

"বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।" (স্তবক-২)

বসন্তশেষের এই দিনটিকে কবির অক্ষয় করে রাখার চেষ্টা যে কতো আন্তরিক অসংশয়িত তা যেন প্রিয়তমা অনুভব করেন। দিনশেষে শেষবিদায়ের ক্ষণটি তার বেদনাশ্রুতে ভরে উঠবে এমন প্রত্যাশা নিয়ে তিনি যুগল-মিলনের কথা ভাবেন নি; বরং দয়িত-দয়িতার শেষবিদায় ক্ষণের করুণারসে ভরা হৃদয়ের ছবিটি স্মৃতি পটে অক্ষয় হয়ে থাকুক— এই তার কামনা।

"ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।" (স্তবক-৩)

প্রেমসম্ভোগ তথা সৌন্দর্যরসসম্ভোগের এমন নির্মল রূপচ্ছবি তো দূর্লভ। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের শেষ আলোটুকু এসে প্রিয়তমার কালো কেশ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঝলসে দিক। এই আবেগ থেকে নিঃসারিত কবিমনের অভিব্যক্তিটুকু কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়।

"ফিরিয়া যেয়ো না, শোন শোন,

সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।

সময় রয়েছে বাকি;

সময়েরে দিতে ফাঁকি

ভাবনা রেখো না মনে কোনো।

পাতার আড়াল হতে বিকাশের আলোটুকু এসে

আলো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।" (স্তবক-৪)

এই রোমান্টিক আবেগ তার অন্তরে জাগ্রত করেছে অতীত লীলার কতো না অমলিন ছবি। প্রিয়তমার সুমধুর হাসি, অকারণ নির্মল উল্লাসে বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠবিড়ালিটিকে হঠাৎ করে ভয় পাইয়ে দেওয়া প্রভৃতি স্মৃতির আবরণ উন্মোচিত করে তার চঞ্চল চরণের গতিকে মন্থর করে দিতে চান না কবি—

"হাসিও মধুর উচ্চহাসে

অকারণ নির্মম উল্লাসে,

বনসরসীর তীরে

ভীরু কাঠবিড়ালিরে

সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।

ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ

দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।" (স্তবক-৫)

তারপর যখন পাখিদের নীড়ে ফেরা শুরু হবে— অস্ফুট কাকলিতে মুখর হবে চারিদিক, গোধূলি-বাঁশরির সর্বশেষ সুরটিও মিলিয়ে যাবে 'বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধায়', তার ছবিটিও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে—

"তার পরে যেয়ো তুমি চলে

ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,

নীড়ে-ফেরা পাখি যবে।

অস্ফুট কাকলিরবে

দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।

বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে

মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।" (স্তবক-৬)

তখন রাত্রি ঘনিয়ে এলে বাতায়নে গিয়ে বসবে তুমি। প্রিয়তমা! এই সব আনন্দ-উজ্জ্বল রসমধুর স্মৃতি- সব পিছনে ফেলে তাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবেন তিনি। আর হয়তো কোনো দিন ফিরে দেখা হবে না তাদের। ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি প্রেমের সেই স্মারকটিকে তিনিও যেন ফেলে দেন। সেই মুহূর্তেও তাই হোক তার শেষ স্পর্শ— শেষ বিদায়ের বাণী যা স্মৃতির অক্ষয় মন্দিরে নিত্যলোকে চির অম্লান, চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—

"রাত্রি যবে হবে অন্ধকার

বাতায়নে বসিয়ো তোমার।

সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,

সুমুখের পথ দিয়ে,

ফিরে দেখা হবে না তো আর।

ফেলে দিয়ে ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।" (স্তবক-৭)

জীবের মধ্যে অনন্তের এই অনুভবকে— এমন গভীর অনুরাগদীপ্ত প্রকাশকে 'সৌন্দর্য সম্ভোগ' ছাড়া আর কীইবা বলা যায়? কবি নিজেও অন্যত্র বলেছেন— "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ।" 'শেষ বসন্ত' কবিতাটি তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

১৩.৬ অনুশীলনী

১।'লিলাসঙ্গী' কবিতাটিতে বিশ্বস্রষ্টার লীলা নিকেতন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আলোচনা করো।

২। 'বকুলবনের পাখি' গীতিকবিতা হিসেবে কতদূর সার্থক?

৩। 'সাবিত্রী' কবিতার সাবিত্রী কথার অর্থটি কিভাবে অনুরণিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

৪। একটি বিশেষ দিনের অনুভব কিভাবে 'লিপি' কবিতায় ধরা পড়েছে ব্যাখ্যা কর।

৫। 'শেষ বসন্তে' জীবনদেবতা ও মানস সুন্দরীর কথা কিভাবে ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র বিশ্বভারতী সং)।

৩। যাত্রী (বিশ্বভারতী সং)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্বভারতী)– প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং)- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং)- প্রমথনাথ বিশী।

৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ)— প্রমথনাথ বিশী।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং)- শঙ্খ ঘোষ।

১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীসম্পাদিত ১ম সং)।

একক ১৪ নির্বাচিত কবিতা

বিন্যাসক্রম

১৪.১ পূরবী

১৪.২ মাটির ডাক

১৪.৩ পঁচিশে বৈশাখ

১৪.৪ তপভঙ্গ

১৪.৫ আগমনী

১৪.৬ লীলাসঙ্গিনী

১৪.৭ বকুল বনের পাখি

১৪.৮ সাবিত্রি

১৪.৯ লিপি

১৪.১০ শেষ বসন্ত

১৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১ পুরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো

আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি

নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝর্না নিল তুলি,

তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু;

নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস বায়ু।

তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে;

নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পূরে;

অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—

গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে

বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে

একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে

আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম

শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী-সম

শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্নবেলায়

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—

বলে নে, ‘ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।

এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়

ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে

পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,

তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

১৪.২ মাটির ডাক

মাটির ডাক

শালবনের ওই আঁচল ব্যেপে

যেদিন হাওয়া উঠত খেপে

ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,

যেদিন দিকে দিগন্তরে

লাগত পুলক কী মন্তরে

কচি পাতার প্রথম কলকথায়,

সেদিন মনে হ'ত কেন

ওই ভাষারই বাণী যেন

লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে;

তাই অমনি নবীন রাগে

কিশলয়ের সাড়া লাগে

শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।

আবার যেদিন আশ্বিনেতে

নদীর ধারে ফসল-খেতে

সূর্য-ওঠার রাঙা রঙিন বেলায়

নীল আকাশের কূলে কূলে

সবুজ-সাগর উঠত দুলে

কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—

সেদিন আমার হ'ত মনে।

ওই সবুজের নিমন্ত্রণে

যেন আমার প্রাণের আছে দাবি;

তাই তও হিয়া ছুটে পালায়

যেতে তারি যজ্ঞশালায়,

কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে

ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে

বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,

"যে জননীর কোলের 'পরে

জন্মেছিলি মর্ত-ঘরে,

প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,

তাহার বক্ষ হতে তোরে।

কে এনেছে হরণ করে,

ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।

বাঁধন-হেঁড়া তোর সে নাড়ী

সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,

ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।

শুনে আমি ভাবি মনে

তাই ব্যথা এই অকারণে,

প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,

তাই বাজে কার করুণ সুরে

‘গেছিস দূরে অনেক দূরে—

কী যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।

তাই এতদিন সকলখানে

কিসের অভাব জাগে প্রাণে

ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে;

ফিরেছি তাই নানামতে।

নানান হাটে, নানান পথে,

হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—

মা আমার এই শ্যামল মাটি,

অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন;

অভ্রভেদী মন্দিরে তার

বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,

ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।

এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে

প্রভাত রবির শঙ্খ বাজে,

আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে;

এইখানে সে পূজার কালে।

সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে

শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।

হেথা হতে গেলেম দূরে।

কোথা যে ইট-কাঠের পুরে

বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে;

তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা;

ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা-

আবর্জনা জমে উপার্জনে।।

যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাদায়,

ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,

শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;

পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,

লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,

কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,

যাই চলে যাই মুক্তিসুখে,

ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে;

আজ ধরণী আপন হাতে

অন্ন দিলেন আমার পাতে,

ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে।

নিশ্বাসে মোর খবর আসে

কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ;

ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়

তার সাথে আর আমার চলায়

আজ হতে না রইল ব্যবধান।

যে দূতগুলি গগন-পারের

আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের

বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,

আজ হয়েছে খোলাখুলি

তাদের সাথে কোলাকুলি

মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।

কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,

সব চেয়ে যা নিকট তাহা

সুদূর হয়ে ছিল এত দিন;

কাছেকে আজ পেলেম কাছে-

চার দিকে এই যে ঘর আছে

তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

১৪.৩ পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।

আজি মোর।

জন্মের-স্মরণ-পূর্ণ বাণী

প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি

হাতে করে আনি

দ্বারে আসি দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;

অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষন্ন ভৈরবী।

শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে।

বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।

রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,

যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে

নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর ‘পরে –

আতা আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,

তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্ক পত্রে তাড়া দিয়ে,

কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে

কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে

বন্ধহীন বেগে।

আর সে একান্তে আসে

মোর পাশে পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার

স্বহস্তে-সজ্জিত উপহার

নীলকান্ত আকাশের থালা

তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে

যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে

তাহার নির্ঘোষ বাজে

ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।

জন্মমরণের

দিগ্বলয়চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,

সে আজি মিলালো।

শুভ্র আলো

কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে

শূন্য দিল ভরে।

আলোকের অসীম সংগীতে

চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়দিপ্রান্ত-তলে নেমে এসে

শান্ত হেসে

এই দিন বলে আজি মোর কানে,

অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে

এক দিন তুমি এসেছিলে

এ নিখিলে

নবমল্লিকার গন্ধে

সপ্তপর্ণপল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে—

শ্যামলের বুকে,

নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।

সেই-যে নূতন তুমি,

তোমারে ললাট চুমি

এসেছি জাগাতে

বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

‘হে নূতন,

দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।

আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি

শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।

মনে রেখো, হে নবীন, তোমার প্রথম জন্মদিন।

ক্ষয়হীন—

যেমন প্রথম জন্ম নিঝরের প্রতি পলে পলে,

তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে

প্রতি ক্ষণে।

প্রথম জীবনে।

হে নূতন,

হোক তব জাগরণ

ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন!

‘হে নূতন,

তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদঘাটন

সূর্যের মতন।

বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি

শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—

সেইমত, হে নূতন,

রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।

ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,

ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।’

উদয়দিগন্তে ওই শুভ্র শঙ্খ বাজে

মোর চিত্ত-মাঝে

চিরনূতনেরে দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ।

১৪.৪ তপোভঙ্গ

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,

হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,

হে ভোলা সন্ন্যাসী।

চঞ্চল চৈত্রের রাতে

কিংশুকমঞ্জরীসাথে

শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।

আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়

গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়

নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তা়োমার পিঙ্গল জটাজালে,

শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,

গেছ কি পাসরি।

দস্যু তারা হেসে হেসে

হে ভিক্ষুক, নিল শেষে।

তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে

ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে

মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে

শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে

উত্তরের মুখে।

তব ধ্যানমন্ত্রটিরে

আনিল বাহির তীরে

পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,

সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা

শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান;

জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান

শুনিলে তন্ময়।

সেদিন ঐশ্বর্য তব

উন্মেষিল নব নব,

অন্তরে উদবেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,

আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার

বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে

সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে।

তব সঙ্গ ধরে।

ললাটের চন্দ্রালোকে

নন্দনের স্বপ্ন-চোখে

নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,

দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,

রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?

মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা

রক্তিম অঙ্কনে?

অগীতসংগীতধার,

অশ্রুর সঞ্চয়ভার,

অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্ন ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।

তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?

নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি

লুপ্ত দিনগুলি।

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া

নিগুঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া

রাখ সংগোপনে।

তোমার জটায় হারা।

গঙ্গা আজ শান্তধারা,

তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।

অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—

'নাহি রে, নাহি রে'।

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,

দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে

উৎকণ্ঠিত বেগে।

নির্জনপ্রান্তরতলে

আলেয়ার আলো জ্বলে,

বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে

শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান

চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।

দুরন্ত উল্লাসে।

বন্দী যৌবনের দিন

আবার শৃঙ্খলহীন

বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন,

বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন,

তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,

স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি।

তব তপোবনে।

দুর্জয়ের জয়মালা

পূর্ণ করে মোর ডালা,

উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,

কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আনি

মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব

সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব

ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে

অগ্নিতেজে দগ্ধ করে

দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তৃণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে

আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে

মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা

শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,

নূতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে

বিলীন বিরহতলে,

উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।

ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি

দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,

আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,

দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি

দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে।

মিলনের লগ্ন আসে,

উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।

সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,

পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে।

কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি

দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি

প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে

মাধবীবল্লরীমূলে,

ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে;

সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে

কবির পরানে।

১৪.৫ আগমনী

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা

বুঝিতে পারো তুমি?

শোন নি কানে হঠাৎ গানে কহিল ‘আহা আহা’

সকল বনভূমি?

শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা

হিমের বায়ে কাপন ধরা

শিথিলমন্থর

‘কে এল’ বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে,

পায়ের ধ্বনি নাহি।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে

দখিন হাওয়া বাহি।

অশোকবনে নবীন পাতা।

আকাশ-পানে তুলিল মাথা,

কহিল, 'এসেছ কি?'

মর্মরিয়া থরোথরো কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা শাখে

'শোনো গো, শোনো শোনো।'

শ্যামা না জানে প্রভাতী গানে কী নামে তারে ডাকে

আছে কি নাম কোনো ?

কোকিল শুধু মুহুরমুহু

আপন মনে কুহরে কুহু।

ব্যথায়-ভরা বাণী।

কপোত বুঝি শুধায় শুধু, 'জানি কি তারে জানি?

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি

অসহ উচ্ছ্বাসে।

আপন মনে মাধবী ভনে কেবলই দিবারাতি,

'মোরে সে ভালোবাসে।'

অধীর হাওয়া নদীর পারে

খ্যাপার মতো কহিছে কারে,

‘বলো তো কী-যে করি?’

শিহরি উঠি শিরীষ বলে, ‘কে ডাকে, মরি মরি!’

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ কাঁদা বাঁশি

জানিস তাহা না কি?

রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি

কেন যে থাকি থাকি?

অবুঝ তোরা তাহারে বুঝি।

দূরের পানে ফিরিস খুঁজি

বাহিরে-আঁখি বাঁধা,

প্রাণের মাঝে চাহিস না যে, তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে

পেয়েছে দ্বার নাড়া,

এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে

দিয়েছে তারি সাড়া।

সহসা বনমল্লিকা যে

পেয়েছে তারে আপন-মাঝে,

ছুটিয়া দলে দলে

‘এই যে তুমি’ ‘এই যে তুমি’ আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব

আপন-মাঝখানে তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব

দ্বিধাবিহীন তানে।

ওদের সাথে জাগ রে কবি,

হৃৎকমলে দেখ সে ছবি,

ভাঙুক মোহঘোর

বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক-না ভরে ভোরের নব রবি,

বাজ রে বীণা বাজ।

গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ রে দুলে কবি,

ফুরালো তোর কাজ।

বিদায় নিয়ে যাবার আগে

পড়ুক টান ভিতর-বাগে,

বাহিরে পাস ছুটি।

প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি।

১৪.৬ লীলাসঙ্গিনী

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে।

মনে হল যেন চিনি—

কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,

ছিলে লীলাসঙ্গিনী?

কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,

মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে

বাজাইলে কিঙ্কিণী।

বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের

আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে

সেদিনের পরিমল।

বকুলগন্ধে আনে বসন্ত

কবেকার সম্বল?

চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ মাঝে।

চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,

সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে

ওগো চিরচঞ্চল।

অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে

সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,

ভুলায়েছ বারে বারে –

বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার

কঙ্কণঝংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে

ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে কখনো আমের নবমুকুলের বেশে

কভু নবমেঘভারে

চকিতে চকিতে চলচাহনিতে

ভুলায়েছ বারে বারে।

নদীকূলে কূলে কল্লোল তুলে

গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

বনপথে আসি করিতে উদাসী

কেতকীর রেণু মেখে।

বর্ষাশেষের গগন-কোনায়-কোনায়

সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়

নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায় ।

ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে –

কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে

গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা

কাজের কক্ষ-কোণে।

সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা

তব খেলা-প্রাঙ্গণে।

নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে

ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,

অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে

নিষ্ফল আয়োজনে ?

কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে

কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে

মানসপ্রতিমাগুলি?

কল্পনাপটে নেশার বরনে

বুলাব রসের তুলি?

বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে

উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,

কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে

পাখায় পুষ্পধূলি।

আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে

মানসপ্রতিমাগুলি।

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়—

সারা হয়ে এল দিন।

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির

শেষ রাগিণীর বীন।

এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,

হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,

আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি

গানহারা উদাসীন।

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,

সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে।

নিশীথ-অন্ধকারে।

মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি

অমাবস্যার পারে?

মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে

তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?

সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে

নীরবে লভিব তারে?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা

রচিবে অন্ধকারে?

যদি রাত হয় না করিব ভয়—

চিনি যে তোমারে চিনি।

চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি

হে গোপনরঙ্গিণী।

নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে

তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,

তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে

হে রসতরঙ্গিণী।

হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,

চিনি যে তোমারে চিনি।

১৪.৭ বকুলবনের পাখি

বকুলবনের পাখি

শোনো শোনো ওগো বকুল বনের পাখি,

দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি।

নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,

মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,

দেখেছ কি মোর দূরে যাওয়া মনখানি—

উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি?

আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,

অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কথা কি?

বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,

রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,

চাপার গন্ধ বাতাসের-প্রাণ কাড়া

যেত মোরে ডাকি ডাকি।

সহজ রসের ঝরনাধারার পরে।

গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি।

নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন সুখে

সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,

বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে

সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।

শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে

নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি?

আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি।

সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি—

তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।

কিছু কি থাকে না বাকি।

বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে

কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

আর-বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি।

যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,

ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে;

আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে।

তোমার গানের রাখী।

আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,

বিদায়ের আগে লও ওগো আপন করে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি।

পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,

খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,

শেষের পেয়ালা ভরে দাও হে আমার

সুরের সুরার সাকী।

আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,

এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো ওগো বকুল বনের পাখি,

মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।

যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,

খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,

কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,

কীর্তি যাক-না ঢাকি

ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে

চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,

যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।

ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,

তাহার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,

হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে ।

চলে যাই গান হাঁকি।

বেণুপল্লবমর্মররবসনে

মিলাই যেন গো সোনার গোধূলিখনে।

১৪.৮ সাবিত্রী

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি

ফেলো, ফেলো টুটি।

হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি

দেখা দিক ফুটি।

বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদবোধিনী বাণী

সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।

মোর জন্মকালে

প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি।

আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,

অগ্নির প্রবাহ।

উচ্ছসি উঠিল মন্দ্রি বারম্বার মোর গানে গানে

শান্তিহীন দাহ।

ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে

উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,

আপনা-বিস্মৃত।

সে চুম্বনমন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে

ব্যথায়-বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,

তারে নমো নম।

তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,

ধ্বংস করি তম,

সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি

মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,

নিঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি

জীবনহিল্লোল।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী;

আয়ুস্রোতমুখে

হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী

বেঁধে নিল বুকে।

আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত

উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরস্ফুরিত

উৎসুক আলোক।

তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত

করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে

কেই বা সে জানে।

কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে

মোর গুপ্ত-প্রাণে।

তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা;

মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা

মুছে যায় সরে।

তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—

না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,

শ্রাবণবর্ষণে;

যোগ দিক নির্বরের মঞ্জীরগুঞ্জনকলরবে

উপলঘর্ষণে।

ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়

বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,

সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,

চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে

জাগিল মূর্ছনা।

আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে

চঞ্চল উন্মনা।

জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী

ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,

লয়ে তার ডালি।

সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী

আলোর কাঙালি?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ

শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ

অগ্নি-উৎসধারে।

সীমন্তে, গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,

প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোকবিন্দুর

তার স্নিগ্ধ ভালে।

দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগভীর বাজুক সিন্ধুর

তরঙ্গের তালে।

১৪.৯ লিপি

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন

তৃপ্তিহীন

একই লিপি পড় ফিরে ফিরে?

প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে

আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,

স্বর্ণবর্ণে লিখা

প্রভাতের মর্মবাণী

বক্ষে টেনে আনি

গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে।

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে

বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,

আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।

অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।

রোমাঞ্চিত বুকে।

পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।

নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি

উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।

কলোল্লাসে উদ্ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে,

'জয়, জয়, জয়।'

ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়

'জাগো রে, জাগো রে'

বনে বনান্তরে।

প্রথমে সে দর্শনের অসীম বিস্ময়

এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,

তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি

উর্ধ্বে চেয়ে কয়—

'জয়, জয়, জয়।'

সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;

প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,

রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়

ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;

সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়—

‘জয়, জয়, জয়।’

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;

উর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।

চিরবিরহের নীল পত্রখানি-'পরে

তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।

বক্ষে তারে রাখো,

শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো;

বাক্যগুলি

পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি—

মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;

পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে

বন্দী কর তারে;

তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে

রাখ তারে ভরি;

সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেলপল্লবে মর্মরি

সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;

মধ্যাহ্নে শোন সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা

আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে

বারম্বার মুছে ফেল; তাই দিকে দিকে

সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে;

অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে

উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে

সব দাও ফেলে

অবহেলে,

আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।

তার পরে আরবার বসে বসে

নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।

যুগযুগান্তর চলে যায়।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে

বসে গেছে একমনে।

শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,

বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।

তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,

চাও মোর পানে।

চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গিখানি

অঙ্কিত করুক মোর বাণী।

শরতে দিগন্ততলে

ছলছলে

তোমার যে অশ্রুর আভাস,

আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিশ্বাস।

অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে।

ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে

কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,

মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি

ওগো বিরহিণী।

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে

খসিয়া পড়িল তব কেশে,

স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে

উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে

ওঠে যে ক্রন্দন,

মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।

স্বর্গ হতে মিলনের সুধা

মর্তের বিচ্ছেদপাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা;

তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,

বিরহিণী অয়ি,

মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

১৪.১০ শেষ বসন্ত

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে

হবে মোর এ আশা পুরাতে-

শুধু এবারের মতো

বসন্তের ফুল যত

যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।

তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,

তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই

এতকাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে

দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে

আমার সময় আর নাই।

তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম

ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে।

তোমার বিকচ ফুলবনে

দেরি করিব না মিছে,

ফিরে চাহিব না পিছে।

দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।

চাব না তাোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি

রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,

সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।

সময় রয়েছে বাকি;

সময়েরে দিতে ফাঁকি

ভাবনা রেখো না মনে কোনো।

পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে

আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে

অকারণ নির্মম উল্লাসে,

বনসরসীর তীরে

ভীরু কাঠবিড়ালিরে

সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।

ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ

দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে

ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,

নীড়ে-ফেরা পাখি যবে

অস্ফুট কাকলিরবে।

দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।

বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে

মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার

বাতায়নে বসিয়ো তোমার।

সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,

সমুখের পথ দিয়ে,

ফিরে দেখা হবে না তো আর।

ফেলে দিয়ে ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

১৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং) – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর